সোনার চাঁদ

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
প্রণীত

মূল্য আট আনা

পঞ্চম সংস্করণ

১৩৪৬

কলিকাতা
৫নং কলেজ স্কোয়ার
শ্রীনারসিংহ প্রেসে
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা
মুদ্রিত

উপহার
"দোল- পূর্ণিমা"
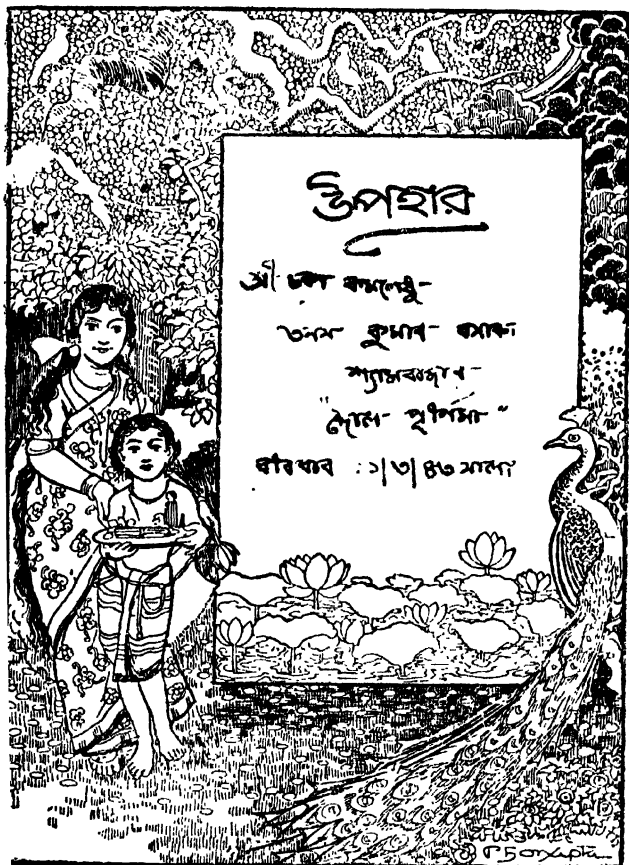
ভক্তের ভগবান—ধনা ... ১ পৃষ্ঠা

সাধনা—ধ্রুব ... ২৩ ”

শিশু-সওদাগর—শ্রীমন্ত ... ৩৮ ”

মধুসূদন দাদা—জটীল ... ৪৮ ”

ভক্ত শিশু—বৃষকেতু ... ৬৪ ”

সোনার চাঁদ

ভক্তের ভগবান

—১—

বড়মানুষ না হইলেও, ধনার বাপ রঘুবর নিতান্ত গরীব ছিল না। তাহার দুইখানা লাঙ্গল, দশ-বারখানা ক্ষেত, তিনটা গাই, চারিটা বলদ ও একটা মহিষ ছিল। ক্ষেতে যা গম হইত, তাহা হইতে সম্বৎসরের খোরাক হইয়াও কিছু বাঁচিত। সুতরাং বাড়ীতে একটা গোলাও ছিল।

রঘুবর পশ্চিমের লোক—তাহার শরীরের শক্তিও

বেশ্। বাড়ীতে চাকর-চাকরাণী ছিল না। রঘুবর চাষী গৃহস্থ। সে নিজে আর তাহার স্ত্রী, দুইজনে মিলিয়াই সংসারের ও গরু-মহিষের কাজ করিত। ধনা তাহাদের একমাত্র ছেলে—বয়স তাহার আট বৎসর। সেও সময়ে সময়ে বাপ-মা'র কার্য্যে সাহায্য করিত। সুতরাং চাকর-চাকরাণীর বড় একটা দরকারও ছিল না।

রঘুবর মূর্খ বটে—লেখাপড়া শিখে নাই ; কিন্তু মন তাহার উচ্চ, আর বুদ্ধি-বিবেচনাও ভাল।

রঘুবর ধাম্মিক, পরোপকারী—কাহারও কোন দরকারে প্রাণ দিয়া কাজ করিত। এইজন্য গ্রামের লোক তাহাকে বড় ভালবাসিত।

অতিথি, সাধু, সন্ন্যাসীর উপর রঘুবরের ভক্তি অসাধারণ। তাহার বাটীর খিড়কির পুষ্করিণীর পাড়ে, সে একখানি ছোটখাট দোচালা ঘর তুলিয়াছিল। সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীরা আসিয়া মাঝে মাঝে থাকিতেন। রঘুবর খুব ভক্তিভরে মন দিয়া তাঁহাদের সেবা-যত্ন করিত।

ক্রমে ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রামে রঘুবরের নামডাক পড়িয়া গেল। প্রায়ই তাহার বাড়ীতে সাধু-সন্ন্যাসী, অতিথি, ফকির প্রভৃতি আসিতে লাগিলেন।

—২—

রঘুবর সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করে, তাহার পুত্র ধনাও বাপের সঙ্গে যোগ দেয়। এইরূপে ধনা সাধু-সন্ন্যাসীর এমন সেবা-যত্ন করিতে শিখিল যে, রঘুবরের আর সেই কাজে না থাকিলেও চলিত।

রঘুবর একা; সংসারের সকল কাজকর্ম্মই নিজেকে দেখিতে হয়। এজন্য সে বড় একটা সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে দিনরাত্রি থাকিতে পারে না—বিশেষতঃ চাষের সময়ে। আট বৎসরের ছেলে ধনা, একাই তাঁহাদিগকে সেবা-যত্নে পরিতুষ্ট করে। এইরূপে ধনার অধিকাংশ সময়ই সন্ন্যাসীদের নিকটে কাটিত।

সন্ন্যাসীদের কেহ ঝুলির ভিতর হইতে ঠাকুর, কেহ বা শালগ্রাম বাহির করিয়া স্নান করান, পূজা করেন, ভোগ দেন। ধনা তাঁহাদের সকল আয়োজন

করিয়া দিয়া চুপটি করিয়া একমনে বসিয়া বসিয়া দেখে। তাহার মনে হয়—এমন সুন্দর কাজ বুঝি বা জগতে আর কিছু নাই।

ক্রমে এমন হইল যে, ধনা সাধু-সন্ন্যাসী ও ঠাকুর ছাড়িয়া, একদণ্ড কোথাও গিয়া স্থির থাকিতে পারিত না।

পাড়ার ছেলেরা খেলিবার জন্য ধনাকে ডাকিতে আসিলে ধনা বলিত—"দেখ-না ভাই, এ বড় মজার খেলা।" এই বলিয়া, তাহাদের লইয়া সন্ন্যাসীদের আড্ডায় হাজির হইত। সেখানে গিয়া চুপ করিয়া ঠাকুরপূজা দেখা ছেলেদের সহ্য হইত না। ততক্ষণ মেধো বৈরাগীর পুষ্করিণীতে সাঁতার দেওয়া, কিংবা হরিদয়ালের মাঠের বটগাছে পাখীর ছানা পাড়া তাহারা বেশী আমোদজনক মনে করিত। তাহারা বিরক্ত হইয়া ধনাকে বলিত—"এ আবার খেলা কি? চল নাগার বিলে 'হেলু' খেলি গে!"

ধনা বলিত—"না ভাই, চুপ ক'রে ঠাকুরের পূজো দেখা, এই খেলাই আমার ভাল লাগে। আমি

যাব না।" সঙ্গীরা বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইত। ক্রমে তাহারা ধনার সঙ্গ ছাড়িল।

ধনা ভাবিল—'আমি ঠাকুর নিয়ে ওই রকম পূজোর খেলা খেল্‌ব—ওরা না-ই বা খেল্‌লে!—'

—৩—

এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল যে, ধনা ঠাকুর ছাড়িয়া আর একদণ্ডও কোথাও যাইত না। তাহার মনে হইত —বুঝি বা ঠাকুর ছাড়া জগতে আর কোথাও কিছু নাই। দিন দিন তাহার স্বভাবেরও খুব পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

একদিন ধনার উপর গাই দুহিবার ভার পড়িল। সে গোহালে গিয়া দেখিল—ছোট বাছুরটি দূরে বাঁধা থাকিয়া, তাহার মায়ের পানে করুণনয়নে চাহিয়া হাম্বা হাম্বা করিয়া ডাকিতেছে। তাহার মাও সন্তানের পানে কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

দুইজনেই বাঁধা ; প্রবল ইচ্ছা থাকিতেও, কেহ কাহারও নিকটে যাইতে পারিতেছে না। তাহাদের প্রাণের কষ্ট ও উভয়ের মিলিত হইবার আগ্রহ যেন চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইতেছে। ধনার আর সহিল না, তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বাছুরটিকে ছাড়িয়া দিল। বাছুরটি একলাফে গিয়া, মহানন্দে মায়ের দুধ খাইতে লাগিল।

ধনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাকে দুধ দুহিতে হইবে—পিতার আদেশ, অবহেলা করিতে পারে না। কিন্তু বাছুরটিকে তাহার মায়ের দুধ খাইতে না দিয়া, কেমন করিয়া নিজে দুহিয়া লইবে ? ইহা তাহার সহ্য হইল না। কিন্তু উপায় কি ?

ধনা দাঁড়াইয়া দেখিল যে, বাছুরটি মহানন্দে দুধ খাইতেছে, আর তাহার দুই কশ বাহিয়া একটু একটু দুধ গড়াইয়া পড়িতেছে। সে তখন উল্লাসে নাচিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বাছুরের মুখের নীচে কেঁড়েটি ধরিল।

—৪—

একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া ধনাদের বাটীতে হাজির হইলেন। তিনি স্নান করিয়া আসিয়া, শালগ্রাম বাহির করিয়া পূজা করিতে বসিলেন। ধনা একমনে বসিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ ধনার মনে হইল—এমনি একটি ঠাকুর পাইলে সেও প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে পারে। এমন আমোদ কি আর কিছুতে হয়? কিন্তু ঠাকুর কোথায় পাইবে? আচ্ছা—সন্ন্যাসীর কাছে চাহিলে হয় না? সে মনে মনে স্থির করিল, যেমন করিয়াই হৌক—হাতে পায়ে ধরিয়াও, সে সন্ন্যাসীর নিকট হইতে একটি ঠাকুর চাহিয়া লইবে।

দুইদিন পরে সন্ন্যাসী যখন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন ধনা তাঁহার কাছে পূজা করিবার জন্য একটি ঠাকুর চাহিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন —"পাগল ছেলে, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে খেলা কর্‌তে নেই।" কিন্তু নাছোড় ধনা সে কথা মানিল না। সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় মুস্কিলে পড়িলেন।

ধনা কিছুতেই মানিল না, সন্ন্যাসীর পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল। তখন বিরক্ত হইয়া, সন্ন্যাসী একটা বাজে নুড়ি দিয়া ভুলাইয়া, ধনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

ধনার আমোদ দেখে কে? সন্ন্যাসী তাহাকে ঠাকুর দিয়াছেন—ধনা আমোদে নাচিয়া উঠিল। তখনই সে সেই সাধুদের চালার একধারে বসিয়া মহা ধূমধামে পূজার আয়োজন করিতে লাগিল।

ধনা বাছিয়া বাছিয়া কাঁড়ি কাঁড়ি সুগন্ধ ফুল তুলিয়া আনিল, দূর্ব্বা আনিল, তুলসী আনিল, চন্দন ঘসিয়া লইল। সন্ন্যাসীরা পূজার জন্য যাহা যাহা করে, তার কোনটিই সে বাকি রাখিল না। বাড়ী হইতে তাহার খাইবার রুটি কয়খানি পর্য্যন্ত আনিল —ভোগ দিবে।

এই সকল আয়োজন করিয়া লইয়া ধনা পূজায় বসিল। পূজায় বসিল বটে, কিন্তু ধনা ত 'মন্তর' জানে না—অথচ পূজা করিতেই হইবে। ধনা সন্ন্যাসীদের দেখাদেখি, তাঁহাদের মত আসন করিয়া

চক্ষু বুজিয়া বসিল ; মাঝে মাঝে এক একবার চক্ষু চাহিয়া, ঠাকুরের মাথায় ফুল, দূর্ব্বা, চন্দন দিতে লাগিল, আবার চক্ষু বুজিয়া বসিল ! কিন্তু কৈ ? ঠাকুর কৈ ? ঠাকুর ত আসিলেন না—খাইলেনও না—যেমন রুটি তেমনই যে পড়িয়া রহিয়াছে !

ধনা ভাবিল—ঠাকুর আসিতেছেন না কেন ? সে কি কোন দোষ করিয়াছে ? ধনা বিস্তর ভাবিল, তাহার মনে পড়িল না। সে ত সন্ন্যাসীদের মত সকল জিনিসই যোগাড় করিয়াছে—কিছুই বাকি রাখে নাই, তবে ঠাকুর আসিয়া খাইলেন না কেন ?

তাহার মনে বড় কষ্ট হইল। ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অভিমানে ভাঙ্গিয়া পড়িল, চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। সে আর থাকিতে পারিল না—ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। "ও ঠাকুর, খাও—তোমার পায়ে পড়ি—খাও" বলিয়া আকুল হইয়া, কতবার মাটিতে গড়াগড়ি দিল—কত অনুনয়-বিনয়, কত খোসামুদি করিল ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—ঠাকুর দেখাও দিলেন না, খাইলেনও না।

ঠাকুর খাইলেন না—সে কি খাইতে পারে? কাজেই সেদিন ধনা কিছুই খাইল না—উপবাসী থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

—৫—

পরদিনও ঐ প্রকারে গেল। ঠাকুর খাইলেন না, ধনাও খাইল না!

তৃতীয় দিনে ধনা ভাবিল—'পূজার নিশ্চয়ই কোন গোল হইয়াছে, তাই ঠাকুর আসেন নাই। আচ্ছা, আজ একবার ভাল করিয়া আয়োজন করিয়া দেখিব—ঠাকুর আসিয়া খান কি না? আজও যদি ঠাকুর আসিয়া না খান, তাহা হইলে আর ঠাকুরকে ডাকিব না—পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া মরিব।'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দুইদিন উপবাসে কাতর ধনা, অতি কষ্টে টলিতে টলিতে গিয়া স্নান করিল। তারপর সে সাজি ধুইয়া বাছা বাছা ফুল তুলিল, এক একটি করিয়া দূর্ব্বা বাছিয়া লইল, চন্দনপিঁড়ি ধুইয়া বেশ্ করিয়া চন্দন ঘসিল।

আজ আর তাহার হাত-পা উঠিতেছে না, সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে—মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছে—চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখিতেছে। আট বৎসরের কচি ছেলে—দুইদিন উপবাসে কাটিয়াছে, তার একটুখানি কোমল প্রাণে আর কত সহ্য হয় ?

কিন্তু তবুও কে জানে কেন—তাহার প্রাণে আজ কেমন এক প্রকার আনন্দ হইতেছে। তাহার প্রাণ যেন থাকিয়া থাকিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। সে পূজার আয়োজন করিতে করিতে, একমনে ঠাকুরকে ভাবিতে লাগিল। সে তাহার মায়ের কাছে শুনিয়াছিল, ঠাকুরের চেহারা অতি সুন্দর। কালোয় আলো, ত্রিভঙ্গিম ঠাম, মাথায় শিখিপুচ্ছের চূড়া, মুরলীধারী সেই মূর্ত্তি যেন তাহার চারিদিকে নাচিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মন আজ ঠাকুরে মগ্ন—সে শরীরের কষ্ট ততটা অনুভব করিল না।

পূজার আয়োজন সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া, ধনা বাড়ী হইতে তাহার খাইবার রুটি আনিয়া সেইখানে রাখিল। তারপর তাহার পূজা আরম্ভ হইল।

ধনা চক্ষু বুজিয়া দেখিল—যেন সেই কালোয় আলো—ত্রিভঙ্গিম ঠাকুর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সে তখন বড় করুণস্বরে বলিল—"আমি মন্তর জানি না—মূর্খ ছেলে। কিন্তু তা ব'লে তুমি সন্ন্যাসীদের যেমন ঠাকুর, আমারও তো তেম্‌নি। তাঁরা মন্তর পড়েন ব'লে তুমি খাও—আমি কথায় বল্‌লে তুমি খাবে না কেন? তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর—খাও।"

ধনার মনে হইল, ঠাকুর বুঝি খাইতেছেন। সে আনন্দে চক্ষু মেলিল। কিন্তু হরি হরি!—কোথায় কে! যেমন রুটি রাখিয়াছিল তেমনই যে রহিয়াছে। সে কাতর হইয়া আবার চক্ষু বুজিল।

চক্ষু বুজিলেই আবার সম্মুখে সেই কালোয় আলো—ত্রিভঙ্গিম মূর্ত্তি! আবার চক্ষু চাহিল—কোথাও কেউ নাই। আবার চক্ষু বুজিল—আবার সেই মূর্ত্তি!

ধনা বুঝিতে পারিল না—একি ব্যাপার! তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। উপবাসের কষ্ট

যেন নূতন হইয়া তাহাকে বেড়িয়া ধরিল। তাহার আর হাত-পা উঠে না—সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছে, অবশ হইয়া যাইতেছে—চক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছে।

সে আর একবার আশায় আশায় চক্ষু মেলিল—কিন্তু যেখানকার যাহা যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে, ঠাকুর আসিয়া খান নাই।

তখন দারুণ অভিমান-ভরে কাঁদিতে কাঁদিতে, ডুবিয়া মরিবার জন্য, ধনা গিয়া জলে নামিল। এত করিয়া উপবাসী থাকিয়া মাথা খুঁড়িল, তবু ঠাকুর আসিলেন না। তার উপর উপবাসের কি ভয়ানক কষ্ট! তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে আর সহে না,—সে মরিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবে।

ধনা দৃঢ়মনে জলে নামিতে লাগিল। পা ডুবিল, কোমর ডুবিল, বুক ডুবিল, গলা জল—আর একটু—আর একটু হইলেই তাহার সব যন্ত্রণা ঘুচিবে।

সহসা অতি মধুর, অতি কোমল স্নেহমাখা স্বর ধনার কর্ণে গেল—"ধনা! ফিরে আয়, খাচ্ছি।"

ধনা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—মরি মরি—আহা কি সুন্দর,—কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! মুহূর্ত্তে তাহার সকল কষ্ট—সকল যন্ত্রণা ঘুচিয়া গেল, দেহে নূতন বল আসিল।

ধনা আনন্দে বিহ্বল হইয়া, দুইটি চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে, উঠিয়া আসিয়া ঠাকুরের পায়ে লুটাইয়া পড়িল; বলিল—"তুমি এত নিষ্ঠুর, দু'দিন আমাকে খেতে দাও নি!—তার উপর আমায় ডুবিয়ে মারছিলে!"

শ্রীকৃষ্ণ, আদরে ধনার মুখ চুম্বন করিয়া রুটি খাইতে লাগিলেন। ধনা দেখিল—ঠাকুর তাহার সব রুটি খাইয়া ফেলিতেছেন। ধনা আর থাকিতে পারিল না—সে দুইদিন খায় নাই। সে তাড়াতাড়ি ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিল—"ঠাকুর, তুমি যে সব রুটি খেয়ে ফেল্‌ছ? আমি কি খাব? আমি যে দু'দিন খাই নি, জান?"

শ্রীকৃষ্ণ মুচকি হাসিয়া ধনাকে কোলে লইলেন এবং আপন হাতে তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন।

—৬—

ধনার পূজা সফল হইল। ভক্তির বলে সে শ্রীকৃষ্ণকে পাইল, ভক্তির ডোরে ঠাকুরকে বাঁধিয়া ফেলিল। এখন ডাকিলেই ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হন, ধনার সঙ্গে খেলা করেন, তাহার গাই দুহিয়া দেন, আরও কত কাজ করিয়া দেন। ধনাও দিনরাত্রি ঠাকুর লইয়া থাকে।

এইরূপে দিন যায়। ক্রমে চাষের সময় উপস্থিত হইল। ধনাদের প্রতিবাসী চাষীরা সকলে মহাব্যস্ত। তাহারা লাঙ্গল, বলদ লইয়া মাঠে চাষ করিতে আরম্ভ করিল। নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে, রঘুবর যথাসময়ে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতে পারে নাই। কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকা চলে না। দেরী হইলে সকলই নষ্ট হইবে। রঘুবর চেষ্টা করিয়া দুই-চারিজন লোক লইয়া, কোন মতে ক্ষেত কয়টা চষিয়া ফেলিল। কিন্তু সকলেই তখন নিজ নিজ ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত। তাহারা বীজ বুনিবার জন্য দেরী করিতে পারিল না। রঘুবরও ইদানীং নানা কাজে ব্যস্ত—কাজেই ধনাকে

ডাকিয়া কতকগুলি বীজ দিয়া মাঠে বুনিতে পাঠাইল। ধনা বীজগুলি লইয়া মাঠের দিকে চলিল।

ধনা সর্ব্বদাই তাহার ঠাকুরকে ডাকিত, ঠাকুরও আসিয়া যখন-তখন হাজির হইতেন। সে মাঠে বীজ বুনিতে গেল, ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

কিছুদূর যাইতেই, পথের মাঝে কতকগুলি ভিক্ষুক আসিয়া ধনাকে ঘিরিল। তাহারা দুই-তিন দিন খায় নাই—মরণাপন্ন।

ভিক্ষুকদিগকে দেখিয়া ধনার প্রাণে বড় কষ্ট হইল ; কিন্তু কি দিবে ?—তাহার ত কিছুই নাই।

ভিক্ষুকেরা ধনার বীজ-গম দেখাইয়া বলিল যে, উহার এক এক মুঠা পাইলে তাহারা খাইয়া বাঁচে।

ধনা বড় বিপদে পড়িল। তাহার ইচ্ছা, সে বীজগুলি ভিখারীদিগকে দেয়, কিন্তু এগুলি যে মাঠে বুনিবার জন্য তাহার পিতা দিয়াছে ! বীজগুলি দিলে সে বাপের কাছে কি জবাব দিবে ? সে কাতরনয়নে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিল—"ঠাকুর, এদের দিকে দেখ না ? আহা, এদের কত কষ্ট !"

সমগুলি ভিখারীদিগকে বিলাইয়া দিল —১৭ পৃঃ

ধনার মনের ভাব বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“বেশ্ ত ওগুলি দিয়ে দাও।”

ধনা বলিল—“কিন্তু, বাবা জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেব? বাপ-মার কাছে যে মিথ্যা বলতে নেই!”

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“মিথ্যা বলবে কেন, ব’লো—তোমাদের ক্ষেতেও গম হবে।”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ধনা খুব খুশী হইল এবং মহানন্দে গমগুলি ভিখারীদিগকে বিলাইয়া দিল।

—৭—

যে সন্ন্যাসী ধনাকে ঠাকুর দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি অনেক দিনের পরে আবার আসিলেন। ধনার নিকট ঠাকুরের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন; প্রথমতঃ কথাটা তাঁহার বিশ্বাসই হইল না। তিনি বলিলেন—“আচ্ছা আমাকে ঠাকুর দেখাতে পার?”

ধনা বলিল—“কেন পারব না?”

শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া ধনা যখন বলিল, "ঠাকুর, সন্ন্যাসীকে দেখা দিতে হবে" তখন ঠাকুর সম্মত হইলেন না, বলিলেন—"তা কি ক'রে হবে? তোমার মত তার ত ভক্তি-বিশ্বাস নেই, সে দেখা পাবে না। তা ছাড়া সে জোচ্চোর—ঠাকুর ব'লে তোমাকে একটা নুড়ি দিয়ে ভুলিয়ে গিয়েছিল।"

ধনা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"এ কি বল্‌ছ ঠাকুর? সন্ন্যাসী ঠাকুর নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে, পৃথিবীর সকল স্থানে, সকল বস্তুতে, সকল জীবে তুমি সকল সময় বর্ত্তমান রয়েছ! সামান্য ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত তোমাকে ছাড়া নয়। যে যেখানে, যে বস্তুতে, যে ভাবে তোমাকে চায়,—সে সেখানে, সেই বস্তুতে সেই ভাবে তোমাকে পায়। তার প্রমাণ একটা তুচ্ছ নুড়ি, যাতে তোমায় পেয়েছি! তবে নুড়ি দিয়ে গিয়েছিল ব'লে সন্ন্যাসীকে জোচ্চোর বল্‌ছ কেন? সেই নুড়ি হ'তেই ত তোমায় পেয়েছি!"

ধনার মনের কথা বুঝিয়া ঠাকুর বলিলেন—

"পৃথিবীতে বিশ্বাস আর ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যার এই দুটি জিনিস আছে, তার সবই আছে—সে রাজারও রাজা। আর যার এই দুটি জিনিস নেই, পৃথিবীতে তার কিছুই নেই, সে কাঙ্গালেরও কাঙ্গাল। বিশ্বাস আর ভক্তিই সকলের মূল। আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সব কিছুতেই আছি সত্য, কিন্তু বিশ্বাস আর ভক্তি না পেলে সেখান হ'তে স'রে যাই। বিশ্বাস আর ভক্তি থাক্‌লে মানুষ সংসারে সুখী হয়, আর তা না থাক্‌লে—মানুষ বড় কষ্ট পায়।"

ধনা সব শুনিল এবং বুঝিল, কিন্তু তবু সে ছাড়িল না; ঠাকুরকে জোর করিয়া ধরিয়া বসিল—"সন্ন্যাসীকে দেখা দিতেই হবে!"

ঠাকুর ভক্তের উপরোধ এড়াইতে পারিলেন না, বলিলেন—"সন্ন্যাসীকে ব'লো—সে তোমাকে কোলে নিয়ে বস্‌লে, আমার দেখা পাবে।"

সন্ন্যাসী ধনাকে কোলে লইয়া বসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিলেন।

—৮—

এদিকে সকলেরই ক্ষেতে ফসল হইয়াছে, কেবল রঘুবরের মাঠ ফাঁকা—ধূ ধূ করিতেছে। চাষারা সকলেই হায় হায় করিতে করিতে, রঘুবরের নিকটে দুঃখ প্রকাশ করিয়া গেল।

রঘুবর অবাক্ হইয়া পড়িল। সে ত ক্ষেতে বীজ বুনিবার জন্য ধনাকে পাঠাইয়াছিল। তবে কি সর্ব্বনেশে ছেলে বীজ বুনে নাই? তবে ত মহা সর্ব্বনাশ!—এখন উপায়?

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। ঠাকুরঘরের চালায় বসিয়া, ধনা ঠাকুরকে ফুল চন্দন দিয়া সাজাইতেছিল। রঘুবর বিষম রাগিয়া, রক্তবর্ণ চক্ষে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। পিতার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ধনা চমকিয়া উঠিল।

দাঁতে দাঁত ঘসিয়া রঘুবর কর্কশ স্বরে ধনাকে বীজ বুনিবার কথা জিজ্ঞাসা করিল। ফাঁকা মাঠ দেখিয়া, চাষারা যে দুঃখ করিতে করিতে তাহাকে সেই কথা জানাইয়া গিয়াছে—তাহাও বলিল।

ব্যাপার বুঝিয়া, পিতাকে অস্থির হইতে নিষেধ করিয়া ধনা প্রফুল্লমুখে বলিল—"আমাদেরও গাছ হয়েছে—ফসলও হয়েছে।"

রঘুবর ভাবিল,—'এ্যাঁ—ধনা বলে কি? তবে কি সকলেই মিথ্যা বলেছে? অসম্ভব! তাদের তাতে লাভ কি? ধনাই মিথ্যা বল্‌ছে।' তারপর সে ধনাকে বলিল—"আচ্ছা ফসল যে হয়েছে—তা দেখাতে পার?"

ধনা দৃঢ়তার সহিত বলিল—"নিশ্চয়ই দেখাব।" —এমনই তাহার অটল বিশ্বাস! ঠিক হইল পরদিন প্রাতঃকালে মাঠে গিয়া, ধনা গাছ ও ফসল দেখাইবে।

সকলেই শুনিল—ধনা নাকি বলিয়াছে—সে বীজ বুনিয়াছে, সকালে গাছ ও ফসল দেখাইবে। কি সর্ব্বনেশে ছেলে গো?—সন্ধ্যাবেলায়ও সকলে যে ফাঁকা মাঠ দেখিয়া আসিয়াছে!

সকাল হইতে না হইতেই গ্রামশুদ্ধ লোক সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল—রঘুবরের সমস্ত ক্ষেতই গমের গাছে ভরিয়া গিয়াছে—দশগুণ বেশী

ফসল হইবে। প্রভাত-বায়ুতে গাছগুলি সমুদ্র-তরঙ্গের মত দুলিতেছে।

সেই মাঠের মাঝে ধনা, জোড়হাতে শূন্য পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলেই দেখিল—তাহার মুখে যেন দিব্য জ্যোতিঃ খেলা করিতেছে। তাহারাও ধনার দেখাদেখি শূন্যে চাহিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল—আকাশের গায় এক অপূর্ব্ব আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সকলেই বুঝিল, ভক্ত ধনার ভক্তি-ডোরে বাঁধা পড়িয়া, ভক্তের ভগবানই এই খেলা দেখাইলেন!

সাধনা

—১—

সেদিন খুব ঝড়-বাদল। রাজা উত্তানপাদ শিকার করিতে বাহির হইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। ঝড়ের দাপটে তাঁহার সঙ্গের লোকজন সব কে কোথায় গিয়াছে তার ঠিক-ঠিকানা নাই। রাজা ভিজিতে ভিজিতে বনের ভিতর তাঁহার লোকজনকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; অবশেষে সাম্‌নে একটি কুঁড়ে-ঘর দেখিতে পাইলেন। তিনি কুঁড়েঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"ঘরে কে আছ, দরজা খোল, আমি ঝড়-ঝাপ্‌টায় মারা গেলাম।"

তখনই একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহার হাতে আলো ছিল, রাজা তাহাকে দেখিয়া অবাক্—এ যে পাটরাণী সুনীতি!

রাজার দুই রাণী; পাটরাণী—সুনীতি, আর

ছোট—সুরুচি। রাজা কিন্তু ছোটকেই বেশী ভালবাসিতেন। সুরুচিও সুবিধা বুঝিয়া রোজ রোজ রাজার কাছে সুনীতির বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতেন। ক্রমে রাজার কান এমনি ভারি হইল যে, রাজা শেষে সুনীতিকে বনে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার খোঁজ-খবর পর্য্যন্ত করিতেন না।

সুনীতি বনে মুনিদের আশ্রমের নিকট একখানি কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিলেন। তিনি আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকেন আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটান।

ভগবানের কেমন খেলা—ঝড়-বাদলে পড়িয়া রাজা সেই পাটরাণী সুনীতির ঘরেই আজ আসিয়া হাজির হইলেন। রাণী অনেক দিনের পর রাজাকে পাইয়া খুব আনন্দে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

পরের দিন ঝড়-বাদল থামিয়া গেল। আকাশ পরিষ্কার হইল। রাজা চলিয়া গেলেন। যাওয়ার সময়ে তিনি রাণীর খোঁজ-খবর নিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া গেলেন। আশ্বাস দিয়া গেলেন বটে, কিন্তু রাজধানীতে গিয়া, ছোটরাণী সুরুচির ভয়ে, তিনি

কিছুই করিতে পারিলেন না ; ক্রমে ক্রমে তিনি সুনীতির কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।

সুনীতি আবার আগের মত, উপাস্য দেবতাকে ধ্যান করেন, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটান।

—২—

ছোটরাণী সুরুচির একটি ছেলে হইল, রাজা আদর করিয়া নাম রাখিলেন—উত্তমকুমার। এদিকে বনে, কুঁড়েঘরে সুনীতিরও একটি দিব্যি সুন্দর ছেলে হইল। ছেলের রূপে কুঁড়েঘরখানি যেন আলো হইয়া উঠিল। মুনিরা ছেলের নাম রাখিলেন—ধ্রুব।

রাজবাড়ীতে উত্তমকুমার রাজা-রাণীর আদরে যেমন দিন দিন বাড়িতে লাগিল, বনে ধ্রুবও মায়ের কোলে দিন দিন বড় হইতে লাগিল। তফাতের মধ্যে, উত্তমকুমার ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন খাইয়া, ভাল ভাল পোষাক পরিয়া সাজিয়া গুজিয়া, লোকের কোলে, কাঁধে, পিঠে চড়িয়া বেড়ায় ; আর ধ্রুব—গরীব মায়ের গরীব ছেলে, কোথায় কি পাইবে—বনের

ফলমূল খাইয়া, গাছের ছাল পরিধান করিয়া, ধূলা-কাদা মাখিয়া খেলা করে! কিন্তু তাহাতেই, তাহার রূপ যেন ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সে যেখানে যায় সে জায়গা আলো হইয়া উঠে তাহার রূপের জৌলসে। ধ্রুব বড় সুলক্ষণ, ভারি শান্ত-শিষ্ট, বড় নরম-স্বভাব। যে দেখে, তাহারই ধ্রুবকে বুকে করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। মুনি-ঋষিরা এই সব দেখিয়া বলেন—"এ ছেলে সামান্য নয়; পরম ধার্ম্মিক হবে, মায়ের দুঃখ ঘোচাবে।"

দেখিতে দেখিতে ধ্রুব পাঁচ বছরে পড়িল।

—৩—

সেই বনে মুনি-ঋষিদের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছিল, ধ্রুব তাহাদের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত। তাহারাও ধ্রুবকে বড় ভালবাসিত।

একদিন খেলিতে খেলিতে, একটি ছেলে ধ্রুবকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কার ছেলে ভাই?"

ধ্রুব উত্তর করিল—"কেন ভাই, আমি আমার মায়ের ছেলে।"

এই কথা শুনিয়া সব ছেলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল—"দূর ভাই, তোর বাপ কে, সে-কথা জিজ্ঞেস কচ্ছি।"

ধ্রুব জন্মের পর হইতে কখনও বাপকে দেখে নাই, নামও শুনে নাই। সে বলিল—"আমি ত ভাই তা জানি না।"

তখন একটি ছেলে বলিয়া দিল—"তোর মাকে জিজ্ঞেস করিস্, তা হ'লেই জান্‌তে পার্‌বি।"

ধ্রুব মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া, পরের দিন বলিল—"আমি ভাই রাজা উত্তানপাদের ছেলে।"

এইকথা শুনিয়া, সব ছেলে হাসিয়া উঠিল, তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাড়াইয়া দিল। কেহ তাহার সঙ্গে খেলিতে চাহিল না। সবাই বলিল—"তুই যদি রাজপুত্তুর, তবে তোর এমন দশা কেন? তোর পোষাক, গয়না কৈ? যা দেখি, তোর বাপের কাছ থেকে গয়না কাপড় নিয়ে, প'রে আয় দেখি!

তবে বুঝ্‌ব তুই রাজার ছেলে; নইলে জানব—তুই মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদীর সঙ্গে আমরা কেউ খেল্‌ব না।”

ধ্রুবের কোমল প্রাণে ভারি কষ্ট হইল, চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। সে বলিল—“দেখিস্‌, আমি এই চল্‌লাম, নিশ্চয় আনব।”

এই কথা বলিয়া, সেই দুধের ছেলে একলা বাপের কাছে চলিল।

কোনমতে বন পার হইয়া, নগরের মধ্যে ঢুকিয়া সে যাহার দেখা পায় তাহাকেই রাজবাড়ী কত দূরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। একটি লোক তাহার অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য দেখিয়া আদরের সহিত কোলে নিয়া তাহাকে রাজবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল।

—৪—

সকালবেলার সভার কাজ শেষ করিয়া রাজা যখন উঠিতেছিলেন এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন—দেউড়ীতে একটি পরম সুন্দর ঋষি-

কুমার আসিয়া বলিতেছে,—সে রাজার ছেলে রাজার কাছে যাইতে চায়।

এই কথা শুনিয়াই রাজার প্রাণ চমকিয়া উঠিল, হঠাৎ তাঁহার সুনীতির কথা মনে পড়িল! তিনি ছেলেটিকে সভায় আনিতে হুকুম দিলেন।

ধ্রুব সভায় আসিলে, রাজা তাহার চেহারা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তাহার রূপে রাজসভা যেন আলোকিত হইয়া উঠিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাহার নাম ধ্রুব,—পাটরাণী সুনীতির ছেলে। রাজার প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া আদর করিতে করিতে যখন সিংহাসনে বসাইতে গেলেন, অমনি কোথা হইতে বাঘিনীর মত ছোটরাণী উত্তমকুমারের হাত ধরিয়া সভায় আসিয়া হাজির হইলেন। রাজা, ভয়ে তাড়াতাড়ি ধ্রুবকে কোল হইতে সিংহাসনের নীচে নামাইয়া দিলেন।

ছোটরাণী নিজের ছেলেকে সিংহাসনে রাজার কোলে বসাইয়া দিয়া দুই চোখ লাল করিয়া ধ্রুবকে

বলিলেন—"দূর হ এখান থেকে। তোর এমন কি ভাগ্যি যে—এই সিংহাসনে উঠিস্? আগে হরির তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রে এসে আমার পেটে জন্ম গ্রহণ কর, তবে ওখানে জায়গা পাবি।" এই বলিয়া সুরুচি ধ্রুবকে তাড়াইয়া দিলেন

রাজা চুপচাপ বসিয়া রহিলেন, রাণীর ভয়ে আর একবারও ধ্রুবের মুখপানে চাহিলেন না। ধ্রুব কাঁদিতে কাঁদিতে আস্তে আস্তে বনের দিকে চলিল।

—৫—

এদিকে ধ্রুবের খেলাধূলা করিয়া ঘরে ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবু সে আসিল না। দুধের ছেলে—সেই যে সকালবেলা উঠিয়া খেলিতে গিয়াছে, এখনও তাহার এক ফোঁটা জলও মুখে পড়ে নাই। মাতা সুনীতি ছট্‌ফট্ করিতে করিতে একবার ঘরে যান আবার বাহির হইয়া দেখেন—ধ্রুব আসিয়াছে কিনা। মুনিঋষিদের মেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল, ধ্রুবের সঙ্গীরা

সকলে তাহাকে চারিদিকে খুঁজিতে বাহির হইল। এমন সময় চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্রুব মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুনীতি তখনই ছেলেকে কোলে লইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। তারপর তিনি আদর করিয়া চুমা খাইয়া বলিলেন—"কি হয়েছে বাবা?"

ধ্রুব ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে এক এক করিয়া সব কথা মায়ের কাছে বলিল।

তখন রাণী ধ্রুবকে নানা মিষ্ট ব্যবহারে শান্ত করিয়া বলিলেন—"বাবা, এ সংসারে হরিকে ডাকার চেয়ে আর ভাল কাজ কিছুই নেই, তুমি বড় হ'য়ে তাঁকে ডাকবে।"

ধ্রুব তখন আব্‌দার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হরি কে মা, তিনি কোথায় থাকেন? বল—বল্‌তে হবে। না হয় আমি কিছুই খাব না।"

ধ্রুব নাছোড়, সে হরির কথা না শুনিয়া খাইবেও না—শুইবেও না! সুনীতি ছেলেকে কিছুতেই শান্ত করিতে না পারিয়া বলিলেন—"হরি—পদ্ম-

পলাশ-লোচন, ঘোর বনে থাকেন।” তারপর তাহাকে শান্ত করিয়া খাওয়াইয়া কোলের ভিতর নিয়া শুইলেন।

ধ্রুবের প্রাণে কিন্তু শান্তি নাই। রাজসভার কথা তাহার মনে পুনঃ পুনঃ জাগিতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল—‘হরির সন্ধান তো মায়ের কাছে পেয়েছি। এখন যেমন ক’রেই হোক, তাঁকে ধ’রে, দুঃখের কথা জানাব।’ এই ভাবিতে ভাবিতে ধ্রুব ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রে ধ্রুবের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, আর অমনি সকল কথা তাহার মনে পড়িল। তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। মা জাগিয়া উঠিলে বাধা দিবেন—এই ভয়ে সে খুব সাবধানে উঠিয়া আস্তে আস্তে কুঁড়ের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

ধ্রুবের আর কিছুতেই মন নাই, কোন দিকে দৃষ্টি নাই, মনে কেবল এক ভাবনা—কোথায় গেলে পদ্মপলাশ-লোচন হরিকে পাইবে।

গভীর রাত্রি, চারিদিক খাঁ-খাঁ করিতেছে। পাঁচ বছরের ছেলে ধ্রুব একলা—পদ্মপলাশ-লোচন হরির সন্ধানে বনের ভিতর প্রবেশ করিল।

—৬—

গভীর বন। চারিদিক নিস্তব্ধ—কোন কিছুর সাড়া-শব্দ নাই। কাঁটায় সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, পায়ে ফুটিয়া রক্ত পড়িতেছে; ধ্রুবের কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে চলিয়াছে আর একপ্রাণে একমনে ডাকিতেছে—"কোথায় পদ্মপলাশ-লোচন হরি, দেখা দাও। মা বলেছেন—তুমি বনে থাক, মায়ের কথা ত মিথ্যা হ'তে পারে না, তুমি কোথায়—দেখা দাও।"

হঠাৎ ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে সমস্ত বন কাঁপিয়া উঠিল। সে রকম আওয়াজ ধ্রুব আর আগে কখনও শুনে নাই—ভাবিল বুঝি তাহার হরি আসিতেছেন। সে তখন খুব ব্যস্ত হইয়া আরও চিৎকার করিয়া "পদ্মপলাশ-লোচন" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে

অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া তাহার সাম্‌নে দাঁড়াইল।

বাঘটার বেশ ক্ষুধা পাইয়াছিল; মানুষের গন্ধ পাইয়া, তাহার লম্বা জিভ হইতে টস্‌টস্‌ করিয়া লালা পড়িতেছে, গায়ের লোমগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার চোখ দুইটি ভাঁটার মত দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। ধ্রুব আর আগে কখনও বাঘ দেখে নাই। সে ভাবিল, এই বুঝি তাহার পদ্মপলাশ-লোচন হরি! সে আনন্দে অজ্ঞানের মত ছুটিয়া গিয়া, বাঘটার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"পদ্ম-পলাশ-লোচন, তুমি এলে?"

হায় হায়—সর্ব্বনাশ হইল! ধ্রুব বুঝি এইবার বাঘের পেটে যায়!

কিন্তু, তাহা হইল না। যে সব ভুলিয়া, এক-মনে ভগবানকে ডাকিতে পারে, ভগবান তাহাকে রাতদিন কোলে করিয়া রক্ষা করেন। পৃথিবীতে কেহ তাহার গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত দিতে পারে না। নহিলে আর "ভক্তের ভগবান" বলে কেন?

কি আশ্চর্য্য!—ধ্রুব যেমন বাঘের গলা জড়াইয়া ধরিল অমনি বাঘের যেন সব ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে গেল; তাহার মনে কেমন আমোদ হইল! বনের সেই হিংস্র জানোয়ার—আদর করিয়া, ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে ধ্রুবের গা চাটিতে লাগিল!

ক্রমে বাঘটা চলিয়া গেল, এখন ধ্রুব বুঝিল—সে তাহার হরি নয়। তখন আবার সে বনে বনে হরিকে খুঁজিতে লাগিল। তাহার ক্ষুধা নাই—তৃষ্ণা নাই, আলস্য নাই—বিশ্রাম নাই, ভয় নাই—ভাবনা নাই, দিন নাই—রাত নাই, কেবল একমনে একপ্রাণে ডাকিতে লাগিল—"কোথায় পদ্মপলাশ-লোচন হরি, দেখা দাও।"

একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া ধ্রুবকে আদর করিয়া কোলে নিয়া চুমা খাইলেন, মন্ত্র দিলেন। তিনি পরে বলিলেন—"এই মন্তর জপ ক'রে তাঁকে ডাক, তা হ'লেই দেখা পাবে।"

এইবার দেবর্ষির কথামত ধ্রুব গভীর মনোযোগের সহিত সেই মন্ত্র জপ করিতে লাগিল।

—৭—

এই রকমে এক বছর কাটিল—ধ্রুব একমনে সেই মন্ত্র জপিতেছে। পাঁচ বছরের দুধের ছেলের এই রকম আশ্চর্য্য তপস্যা দেখিয়া দেবতারা পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহারা ধ্রুবের মাথায় 'পুষ্পবৃষ্টি' করিতে লাগিলেন।

তখন কি আর ভগবান স্থির থাকিতে পারেন,—তিনি ধ্রুবকে দেখা দিয়া, বর নিতে বলিলেন। ধ্রুব আমোদে আত্মহারা হইয়া বলিল—"এই বর দাও প্রভু, যেন ডাক্‌লেই তোমায় পাই।"

ভগবান ধ্রুবকে সেই বর দিলেন এবং বাড়ী যাইয়া মা-বাপের সেবা করিতে বলিলেন।

সুনীতি ধ্রুবকে হারাইয়া পাগলিনীর মত হইয়া ছিলেন; অনেক দিনের পর ছেলেকে পাইয়া যেন নবজীবন লাভ করিলেন। ছেলে মাকেও পদ্মপলাশ-লোচন দেখাইল। মায়ের জীবন সার্থক হইল।

ধ্রুবের আশ্চর্য্য তপস্যার কথা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল। রাজা আর ছোটরাণী আসিয়া

ক্ষমা চাহিয়া ধ্রুবকে আর তাহার মাতা সুনীতিকে পরম যত্নে বাড়ী লইয়া গেলেন।

ধ্রুবকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিলে সে নিজে না বসিয়া উত্তমকুমারকে রাজা করিল। ধ্রুব রাতদিন উত্তমের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে সৎ উপদেশ দিয়া, রাজ্য পালন করিতে লাগিল।

যে রাজ্যে ধার্ম্মিকের বাস—সেখানে কিছুরই অভাব থাকে না। ধ্রুবের গুণে উত্তমকুমারের রাজ্য সুখ-শান্তিময় হইল। পৃথিবী ধন-ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া উঠিল।

যে বিমাতা একদিন হিংসায় ধ্রুবকে বাপের কোল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তিনিই এখন ধ্রুবকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশী ভালবাসিতে লাগিলেন।

ছেলের গুণে বাপ-মা ভগবানের দেখা পাইলেন—তাঁহাদের জন্ম-জীবন সার্থক হইল।

শিশু-সওদাগর

—১—

পাঠশালা হইতে ছল্‌ছল্‌ চোখে মুখভার করিয়া আসিয়া—শ্রীমন্ত সেই যে ঘরের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল, আর কিছুতেই উঠে না। শেষে তাহার মাতা ও বিমাতা দুইজনে আসিয়া, অনেক সাধাসাধি, অনেক আদর করিয়া তাহার অভিমানের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

পাঠশালায় সকল ছেলেই আপন আপন বাপের নাম বলিয়াছে। শ্রীমন্ত কখনও তাহার বাপকে দেখে নাই বা বাপের নামও জানিত না; এইজন্য ছেলেরা সকলেই,—এমন কি গুরুমহাশয় পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে তামাসা করিয়াছে, তাহাকে টিটকারি দিয়াছে। সে আজ তাহার পিতার সমস্ত সংবাদ না পাইলে উঠিবে না, জল গ্রহণও করিবে না।

মাতা ও বিমাতা তখন তাহাকে আদর করিয়া তুলিয়া, তাহার পিতার সংবাদ বলিল এবং অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাহাকে খাওয়াইল।

—২—

শ্রীমন্ত যখন শুনিল—তাহার পিতা ধনপতি সওদাগর সিংহলদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই, এমন কি তাঁহার কোন খবরও পাওয়া যায় নাই,—তখন সে নির্ব্বোধের মত কাঁদিতে বসিল না। সে পণ করিল—নিজে গিয়া পিতার খবর আনিবে। শ্রীমন্ত বালক,—তাহার 'ধনুক-ভাঙ্গা-পণ'—কেহ কিছুতেই টলাইতে পারিল না। সে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিল। তখন কাজেকাজেই, মায়েরা তাহার বিদেশ-যাত্রার আয়োজন করিয়া দিতে বসিল। সৎকার্য্যে পণ করিলে, ভগবান তাহার সহায় হন।

সাতখানি নৌকায় বাণিজ্যের জিনিসপত্র বোঝাই হইল। শুভদিন দেখিয়া, ঘট বসাইয়া মঙ্গলচণ্ডীর

পূজা হইল। শ্রীমন্ত একমনে প্রাণ ভরিয়া মাকে ডাকিল। তাহার মায়েরা, চণ্ডীর প্রসাদী ফুল তাহার মাথায় ছোঁয়াইয়া কাপড়ে বাঁধিয়া দিল।

পাড়াপ্রতিবেশী সকলে মিলিয়া, ঘাট পর্য্যন্ত তাহাকে বিদায় দিতে আসিল। মায়েরা পুত্রের মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া মুখ চুম্বন করিল। শ্রীমন্ত প্রণাম করিয়া দুই মায়ের পদধূলি লইল।

শুভক্ষণে "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া শ্রীমন্ত নৌকায় পা দিল। আর অমনি মাঝিরা পাল তুলিয়া—'বদর বদর' বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

—৩—

বহুদিন ধরিয়া নৌকা চলিতে লাগিল। কত দেশ, কত খাল-বিল, কত নদ-নদী পার হইয়া, শেষে শ্রীমন্তের নৌকাগুলি সমুদ্রে পড়িল। শ্রীমন্তের আর কোন দিকে নজর নাই—কিছুতে মন নাই, সে কেমন করিয়া তাহার পিতাকে পাইবে—দিবারাত্রি কেবল সেই চিন্তা করিতেছে আর একমনে "দুর্গা

দুর্গা” বলিয়া ডাকিতেছে। এমন একমনে এক-প্রাণে সকল ভুলিয়া ডাকিতে পারিলে, মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি শ্রীমন্তকে দেখা দিলেন।

শ্রীমন্তের নৌকাগুলি দক্ষিণ-মহাসমুদ্রে পড়িল। দক্ষিণ-সমুদ্রের একটা জায়গাকে ‘কালীদহ’ বলে। নৌকাগুলি সেইখানে আসিলে, ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হইল। সমুদ্রে তালগাছ-প্রমাণ উঁচু ঢেউ উঠিল—তাহার ডাকে কানে তালা ধরে। ঘোর অন্ধকার, চোখের কিছু দেখা যায় না। নৌকার লোকজন মাঝিমাল্লা সকলেই প্রাণের ভয়ে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কেবল শ্রীমন্ত অচল—অটল। তাহার কোন দিকে দৃষ্টি নাই—সে একমনে প্রাণ ভরিয়া “দুর্গা দুর্গা” বলিয়া ডাকিতেছে।

হঠাৎ শ্রীমন্ত দেখিল—সেই ঘোর অন্ধকারে দুর্দ্দান্ত সমুদ্রের মধ্যে এক স্থানে চারিদিক আলো হইয়া উঠিয়াছে, মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, ঝড় থামিয়াছে। সমুদ্রের অমন ঢেউয়ের মধ্যেও সেখানকার জল

শান্ত—নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। সেই জলে কত শত পদ্ম ফুটিয়া হেলিতেছে—দুলিতেছে। আর সেই পদ্মবনে—পদ্মের উপর বসিয়া আছেন—এক পরমা সুন্দরী। সুন্দরী একহস্তে একটি হস্তী ধরিয়া একবার গিলিতেছেন—আবার উগারিয়া ফেলিতেছেন!

দেখিবামাত্রই শ্রীমন্ত সকল ভুলিয়া "মা মা" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। নৌকার সকলেই অবাক্! তাহারা কেহই প্রথমে কিছু দেখিতে পায় নাই—শেষে সকলেই একে একে শ্রীমন্তকে ছুঁইয়া দেখিতে পাইল, আহা মরি মরি—কি অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য—কি অপরূপ! কমলবনে কমলের উপর এ কামিনী কে?—রূপে দশদিক্ আলো হইয়াছে!

—৪—

মায়ের দর্শন পাইয়া, শ্রীমন্ত আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। তাহার প্রাণে নূতন বল আসিল। সে যেন নূতন জীবন পাইল। সে দুর্গানামে মত্ত

পদ্মের উপর বসিয়া আছেন এক পরমা সুন্দরী —৪২ পৃঃ

হইয়া, একমনে মায়ের রূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিল। ক্রমে তাহার নৌকা সিংহলে আসিয়া পৌঁছিল।

সিংহলে পৌঁছিয়া শ্রীমন্ত ভেট লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল। সেখানে সে শুনিতে পাইল তাহার পিতা এবং আরও অনেকে সিংহলরাজ-কারাগারে বন্দী হইয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই সিংহলে আসিবার সময়ে কালীদহে 'কমলে-কামিনী' দেখিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা দেখিতে চাহিলে, দেখাইতে পারেন নাই—এই তাঁহাদের অপরাধ।

সকল শুনিয়া, শ্রীমন্ত প্রণাম করিয়া রাজাকে কহিল—"আমি 'কমলে-কামিনী' দেখাব।"

রাজা বলিলেন—"আমাকে যদি কমলে-কামিনী দেখাতে পার, তা হ'লে তোমার পিতাকে এবং অন্যান্য বন্দীকে মুক্ত কর্‌ব,—নইলে, তোমাকে মশানে প্রাণ দিতে হবে।"

এই কথা স্বীকার করিয়া, শ্রীমন্ত রাজাকে কমলে-কামিনী দেখাইতে চলিল।

কিন্তু হরি, হরি—এ কি? রাজাকে কমলে-

কামিনী দেখাইতে গিয়া, শ্রীমন্ত দেখিল—সব শূন্য—কোথায় কে ? কোথায় পদ্মবন—আর কোথায় বা কমলে-কামিনী !

তখন রাজা রাগিয়া, মিথ্যাবাদী বলিয়া, শ্রীমন্ত এবং তাহার লোকজন সকলকে কারাগারে দিলেন—সকাল হইলে মশানে সকলের প্রাণবধ হইবে।

সেই অন্ধকার কারাগারে শ্রীমন্ত চোখের জলে ভাসিয়া, একমনে একপ্রাণে কেবল "মা মা" বলিয়া দুর্গাকে ডাকিতে লাগিল।

এদিকে—শ্রীমন্তকে কারগারে লইয়া যাইতে দেখিয়া—রাজার মেয়েটির মনে বড় কষ্ট হইল। সেও সারারাত্রি আপনার ঘরে, একমনে একপ্রাণে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতে লাগিল।

—৫—

পরদিন রাজার কোটাল সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে করিয়া শ্রীমন্তকে কাটিবার জন্য মশানে লইয়া গেল। শ্রীমন্ত বাঁধা হাত দুইটি জোড় করিয়া,

"মা মা" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্গাকে ডাকিতে লাগিল। এদিকে রাজবাটীতে রাজার মেয়েটিও "মা মা" বলিয়া দুর্গাকে ডাকিতেছে! আর ওদিকে শ্রীমন্তের লোকজন "মা দুর্গা, মা দুর্গা" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল—চারি দিকে "মা মা" ডাকের ধূম পড়িয়া গেল। মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি দলবল লইয়া মশানে উপস্থিত হইলেন।

কোটাল শ্রীমন্তকে কাটিতে যাইবে কি—নিজেদেরই প্রাণ বাঁচান ভার হইল! হঠাৎ চারিদিক্ হইতে বিকট "হুম্-হাম্" রব উঠিল। শত শত ভূত-প্রেত, ডাকিনী-হাঁকিনী আসিয়া সৈন্যদের কাহাকেও ত্রিশূলে বিঁধিল, কাহারও চুলের ঝুঁটি ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া আঁছাড় মারিল, কাহারও মুখ আগুনে পোড়াইল—এইভাবে রাজার সমস্ত সৈন্য ছারখার করিয়া দিল।

মা দুর্গা নিজে রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে মশানে আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

—৬—

ভগ্নদূতের মুখে সংবাদ পাইয়া, রাজা নিজে তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল লইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু—হরি হরি—নিমিষের মধ্যে তাহারা সকলেই ধ্বংস হইয়া গেল। এখন রাজার প্রাণ যায়!

যে সকল ভুলিয়া দিবানিশি একমনে "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া ডাকে, মা দুর্গা তাহাকে সর্ব্বদাই কোলে করিয়া সমস্ত বিপদ্‌-আপদে রক্ষা করেন, —এ পৃথিবীতে তাহার কিছুমাত্র ভয়-ভাবনা থাকে না। এমন ভক্তকে যে মারিতে যায়, তাহার কি আর নিস্তার থাকে? রাজারও তাহাই হইল— আজ আর তাঁহার কিছুতেই নিস্তার নাই।

কিন্তু পিতার এই বিষম বিপদে মেয়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। রাজকন্যা ছুটিয়া মশানে আসিয়া চণ্ডীর পূজা আরম্ভ করিল। পূজা দেখিলে ভক্তের প্রাণ নাচিয়া উঠে,—শ্রীমন্তও সেই পূজায় যোগ দিল। ভক্তের ডাকে মা স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি সদয় হইয়া বর দিলেন।

মায়ের দেখা পাইয়া শ্রীমন্ত তাঁহাকে ধরিয়া বসিল—রাজাকে তাঁহার কমলে-কামিনী মূর্ত্তি দেখাইতে হইবে,—সে কথা দিয়াছে। মা, ভক্তের কথা ঠেলিতে পারিলেন না। শ্রীমন্ত রাজাকে কমলে-কামিনী দেখাইয়া আনিল।

রাজা রক্ষা পাইলেন, তাঁহার সৈন্য-সামন্ত সকলেই বাঁচিয়া উঠিল—মশান আনন্দভূমি হইল।

তখন রাজা শ্রীমন্তকে সঙ্গে লইয়া কারাগারে গিয়া, সকল বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। পিতা-পুত্রে এই প্রথম মিলন হইল। ধনপতি মহানন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমন্তকে বুকে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন।

শুভদিনে রাজকন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ হইল। রাজা বিস্তর ধন-দৌলত যৌতুক দিয়া, রাজকন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইলেন।

শিশুর সওদাগরীতে পিতা প্রাণ পাইলেন। ঘরে ঘরে 'মঙ্গলচণ্ডীর জয়' ঘোষিত হইল।

মধুসূদন দাদা

—১—

সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সেদিন খুব অন্ধকার হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে একখানা মস্ত কাল মেঘ সমস্ত আকাশখানাকে আবৃত করিয়া ফেলিল— এলোমেলো বাতাস বহিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সেদিন গুরুমহাশয় সকাল সকাল পাঠশালা ছুটী দিলেন।

সেই গাঁয়ের অনেকগুলি ছেলে পাঠশালায় পড়ে। মেঘ দেখিয়া, কাহারও বাপ, কাহারও দাদা, কাহারও মামা, কাহারও বা জ্যেঠা আসিয়া ছেলে-দিগকে নিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কেবল জটীল একলা বসিয়া রহিল।

জটীলের মা ছাড়া আর কেহ ছিল না। তাহারা বড় গরীব, গাঁয়ের একধারে একখানি ছোট কুঁড়ে-

ঘরে থাকে। তাহাদের কুঁড়ের পাশেই মাঠ, তার পরেই খানিক দূরে বন, তার পরে গাঁয়ের অন্য লোকজনের বাড়ী; আর সেইখানে ঘোষেদের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা।

পাঠশালা হইতে বাড়ী আসিতে জটীলকে সেই বনের ধার দিয়া, মাঠের উপর দিয়া, অনেকখানি ঘুরিয়া আসিতে হয়—অন্য পথ ছিল না।

গুরুমহাশয় ছুটী দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অন্য অন্য ছেলেরাও যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেল, কেবল জটীল একলা পাঠশালায় রহিল। কারণ তাহার ত মা ছাড়া কেহ নাই—কে তাহাকে নিয়া যাইবে!

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ক্রমেই অন্ধকার বাড়িতেছে দেখিয়া জটীলের মনে বড় ভয় হইল। সে তখন হতাশভাবে কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে একলা দাঁড়াইয়া কাঁদিতে দেখিয়া গ্রামের একজন চাষার মনে দয়া হইল; সে তাহাকে বনের ধার পর্য্যন্ত দিয়া আসিল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জটীল কোন রকমে বাড়ীতে আসিল।

—২—

বাড়ীতে আসিয়া জটীল মায়ের গলা ধরিয়া ছল-ছল চোখে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ মা, সব ছেলেরই বাপ, খুড়া, জ্যেঠা, মামা, দাদা, কেহ না কেহ আছে, আমাদের কে আছে মা ?"

মা বলিলেন—"আমাদের আর কেউ নেই বাবা, কেবল মধুসূদন আছেন।"

জটীল আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি আমার কে হন মা ?"

মা বলিলেন—"তিনি তোমার দাদা হন।"

তখন জটীল বায়না ধরিয়া বসিল—"আমি তাঁকে দেখ্‌ব, তুমি ডেকে দাও-না মা! তিনি কোথায় থাকেন ?"

মা তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিলেন—"তিনি বনে থাকেন। তুমি ডেকো—তা হ'লেই তাঁর দেখা পাবে।"

এই কথা বলিয়া ভুলাইয়া, জটীলের মা তাহাকে খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইতে গেলেন। জটীল তখন

"এই যে ভাই, আমি এসেছি।" —৫১ পৃঃ

বলিল—"দেখ মা, পাঠশালা থেকে আস্‌তে, বনের ধারে আমার বড্ড ভয় করে। আমি কাল থেকে মধুসূদন দাদাকে ডেকে আমায় এগিয়ে দিতে বল্‌ব।" এই বলিয়া সেইদিন মধুসূদন দাদার কথা ভাবিতে ভাবিতে জটীল ঘুমাইয়া পড়িল।

তার পরদিন হইতে জটীল প্রত্যহ পাঠশালায় যাইবার সময়, আর বাড়ী ফিরিবার সময়, বনের ধারে যাইয়াই প্রাণ খুলিয়া ডাকিত—"মধুসূদন দাদা! আমার ভয় কচ্ছে, আমায় এগিয়ে দাও-না!"

প্রাণ খুলিয়া একমনে ভগবানকে ডাকিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না—তাঁহাকে দেখা দিতেই হয়। জটীলের ডাকেও ভগবান চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না; তিনি দিব্য সুন্দর ফুট্‌ফুটে এক রাখালের বেশে দুইটি রাঙ্গা পায়ে নূপুরের ঝম্‌-ঝম্ শব্দ করিতে করিতে জটীলের সাম্‌নে আসিয়া বলিতেন—"এই যে ভাই, আমি এসেছি।" তার পর জটীলের মুখে চুমো খাইয়া এবং তাহাকে কোলে নিয়া প্রত্যহই আগাইয়া দিতেন।

—৩—

এই রকমে দিন কাটিতে লাগিল। মধুসূদন দাদাও রোজ রোজ পাঁচ বছরের জটীলকে কোলে নিয়া নানারকম উপদেশ দিতে দিতে আগাইয়া দেন। জটীলের মা অথবা অন্য কেহ এই ঘটনার কিছুই জানিত না। ইহা যে এমন একটা কিছু বিশেষ ঘটনা তাহা একরত্তি ছেলে জটীলের মনেই হইত না, কাজেই সেও এইসব কথা তাহার মার কাছে, কি অপর কাহারও কাছে বলে নাই।

জটীলের চেহারা আর স্বভাব দিন দিন ভাল হইতে লাগিল। মধুসূদন দাদা বলিয়া দিয়াছেন—সেজন্য জটীল প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলে না, কাহারও সঙ্গে কখনও ঝগড়া-ঝাটি করে না, সকলকেই ভালবাসে, গরীব-দুঃখীকে দয়া করে, এমন কি পশু-পক্ষীটির দুঃখে পর্য্যন্ত তাহার চোখের জল পড়ে। সে তাহার মাকে আর গুরুমহাশয়কে খুব ভক্তি করে। তাঁহারা যখন যা বলেন, তখনই সে তাহা করে, তাঁহাদের কোন কথার অবাধ্য হয় না।

এই সব স্বভাব-গুণে গ্রামশুদ্ধ সকলেই জটীলকে ভালবাসিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলা পাঠশালায় গিয়া জটীল দেখিল—যত সব পড়ুয়ারা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে—আর গুরুমহাশয় একগাছা লম্বা লক্‌লকে বেত লইয়া এক এক জনের কাছে গিয়া বেতটা খুব নাচাইতে নাচাইতে বলিতেছেন—"তুই কি দিবি বল?"

কি যে হইয়াছে, জটীল কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আস্তে আস্তে সকলের শেষে দাঁড়াইয়া চুপিচুপি তাহার পাশের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ ভাই, আজ কি হয়েছে ভাই?—গুরুমশায় অমন কর্‌ছেন কেন?"

পাশের ছেলেটি বলিল—"জটীল, তুই আজ এলি কেন? তোকে এখনও উনি দেখ্‌তে পান নি—এই বেলা পালা, নইলে মার খেয়ে আজ তোর হাড় গুঁড়ো হবে।"

জটীল বলিল—"কেন, আমি কি করেছি?"

সেই ছেলেটি বলিল—"জানিস্ নে, পরশু গুরু-মশায়ের বাপের শ্রাদ্ধ হবে, সব পড়োদের খাবার জিনিসপত্র এনে দিতে হবে, নইলে পিঠের ছাল থাক্‌বে না। ভাই, তোর মা গরীব মানুষ, তুই তো কিছু দিতে পার্‌বি নি। তোকে আজ বেদম ঠেঙ্গাবে, তুই পালা।"

জটীল বলিল—"না ভাই, ছিঃ! পালাব কেন? গুরুমশায়কে কি ফাঁকি দিতে আছে? তাতে যে পাপ হয়। আমি ভাই, কিছু যদি দিতে না-ও পারি; তবে চাকরের কাজ কর্‌ব—জল তুল্‌ব,—কাঠ কাট্‌ব, তামাক সেজে দেব। তাতেও না হয়, মার খাব। কিন্তু পালাব না। ছিঃ!—"

—৪—

জটীল দেখিল, গুরুমহাশয় একে একে সব ছেলের কাছে যাইয়া, বেত নাচাইয়া, শাসাইয়া শাসাইয়া বলিতেছেন—"তুই কি দিবি বল?"

ছেলেরা কেউ চাল, কেউ ডাল, কেউ নুন, তেল,

ঘি, ময়দা, চিনি, সন্দেশ, এই রকম যে যাহা পারিবে, তাহাই আনিয়া দিতে রাজী হইল। যে বেশী দিতে পারিবে না বলিল, গুরুমহাশয় অমনি সপাং করিয়া তাহার হাতে খুব জোরে এক ঘা বসাইয়া দিলেন। সে অমনি জ্বালায় হাত রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে—গুরুমহাশয় যে পরিমাণ চাহেন—সেই পরিমাণ আনিয়া দিতে রাজী হইল।

এই ভাবে সকল ছেলের কাছ হইতে গুরুমহাশয়ের বাপের শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ-ভোজনের সবই যোগাড় হইল। বাকি রহিল কেবল দৈ।

এইবার গুরুমহাশয় জটীলের কাছে আসিয়া হাজির হইলেন। খুব শাসাইয়া লক্‌লকে বেতগাছা নাচাইতে নাচাইতে তিনি বলিলেন—"কিরে জটীল, বার মাস ত তুই অম্‌নিই পড়ছিস্, কখনও একটু তামাকও তো এনে দিস্ নি, তুই কি দিবি বল্? এবারে আর ছাড়ান ছোড়ন নেই বাবা; তোর মাকে বলিস্।"

জটীল বলিল—"মাকে ব'লে কি হবে, মা

কোথায় কি পাবেন ? আমরা যে বড় গরীব, দু'বেলা খেতে পাই না, গুরুমশায় ! তবে আমার মধুসূদন দাদাকে বল্‌ব ।”

গুরুমহাশয় বলিলেন—“ও মধুসূদন দাদা টাদা বুঝি না। তোর মা লোকের বাড়ীতে কাজ করে—চাল ঝাড়ে, কাঠ কুড়োয়, আমায় আজ পর্য্যন্ত একটা কানা কড়িও দেয় নি। তুই তাকে বলিস্‌ আমার বাপের শ্রাদ্ধে যত দৈ চাই, তাকে দিতে হবে—নৈলে তোর পিঠের চামড়া তুল্‌ব।”

—৫—

জটীল ভাবিতে লাগিল—তাহার মা বড় গরীব, অনেক দিন ত তাহাদের একবেলা খাওয়াই হয় না। মাকে আর গুরুমহাশয়ের কথা বলিয়া কি হইবে ? মা শুধু মনে কষ্ট পাইবেন আর কাঁদিবেন বই ত নয়। তার চেয়ে সে মধুসূদন দাদাকে বলিবে, তিনি কি একটা উপায় করিয়া দিবেন না ?

জটীল কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া চলিল,

আর মধুসূদন দাদাকে ডাকিতে লাগিল। জটীলের ডাক শুনিয়া কি আর মধুসূদন দাদা থাকিতে পারেন ? তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কাঁদ্ছ কেন ভাই ?"

তখন জটীল মধুসূদন দাদাকে সব কথা বলিল। সে দৈ দিতে না পারিলে যে গুরুমহাশয় তাহার পিঠের চামড়া তুলিবেন বলিয়াছেন সেই কথা বলিতেও সে ভুলিল না।

মধুসূদন দাদা জটীলের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা ভয় কি ভাই ? তুমি ব'লো যে, যত দৈ চাই দেব।" এই বলিয়া মধুসূদন দাদা সেদিন কোলে করিয়া জটীলকে আগাইয়া দিয়া গেলেন।

তার পরের দিন সকালবেলা পাঠশালায় যাইয়া জটীল গুরুমহাশয়কে বলিয়া আসিল—"যত দৈ চাই আমি দেব।"

গরীবের ছেলে জটীলের মুখে এই কথা শুনিয়া পাঠশালা-শুদ্ধ ছেলেরা সকলে হাসিয়া উঠিল।

—৬—

আজ গুরুমহাশয়ের বাপের শ্রাদ্ধ। খুব ধুম-ধাম লাগিয়া গিয়াছে। গ্রামশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। পড়ুয়ারা ভোরবেলা হইতে যার যাহা দিবার কথা ছিল—আনিয়া হাজির করিতে লাগিল। গুরুমহাশয় একখানি পাঁচহাতি কাপড় পরিয়া এক হাতে একটা থেলো হুঁকো লইয়া তামাক টানিতে টানিতে চারিদিক দেখিয়া-শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—এটা সেটা হুকুম করিতেছেন, আর কতক্ষণ পরপরই খুব চেঁচাইয়া এক এক বার পড়ুয়াদের শাসাইতেছেন।

ক্রমে শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় আসিল। জটীল তখনও দৈ আনে নাই দেখিয়া গুরুমহাশয় রাগিয়া গেলেন এবং খুব ধমক দিয়া জটীলকে তাড়াতাড়ি দৈ আনিয়া দিতে বলিলেন।

জটীল এক দৌড়ে সেই বনের ধারে যাইয়া বারংবার মধুসূদন দাদাকে ডাকিতে লাগিল এবং দৈ দিতে বলিল। মধুসূদন দাদা একটি ছোট মাটির

ভাঁড়ে এক ভাঁড় দৈ আনিয়া জটীলের হাতে দিয়া বলিলেন—“এই নিয়ে যাও—এতেই হবে।”

—৭—

ব্রাহ্মণদের পাতা পড়িয়াছে, সবাই খাইতে বসিয়াছে, কিন্তু এখনও দৈ আসিল না। গুরুমহাশয় রাগে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। এমন সময় জটীল সেই ছোট দৈয়ের ভাঁড়টি লইয়া আসিয়া বলিল—“এই নিন্‌ দৈ।”

ছোট্ট এক ভাঁড় দৈ দেখিয়া পড়ুয়ারা সকলে হাততালি দিয়া উঠিল, লোকজন সব হাসিতে লাগিল। গুরুমহাশয় ত রাগে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে —যা মুখে আসিল—তাই বলিয়া গালাগালি দিতে দিতে জটীলকে মারিতে আরম্ভ করিলেন।

মধুসূদন দাদা বলিয়া দিয়াছেন, “এই দৈয়েতেই হইবে”—একরত্তি ছেলে, তাহার সেই কথাতেই বিশ্বাস। তবে গুরুমহাশয় মারে কেন? সে যত বলে “মধুসূদন দাদা ব’লে দিয়েছেন, এই দৈয়েতেই হবে”,

গুরুমহাশয় ততই মারেন! সে আর সহিতে না পারিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। দৈয়ের ভাঁড়টা তাহার হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়া, উল্‌টাইয়া সব দৈটুকু পড়িয়া গেল,—কেহই সেই দিকে নজরও করিল না!

এত মারিয়াও গুরুমহাশয়ের রাগ গেল না। "ঐ ভাঁড়টা আজ ঐ বেটার মাথায় ভাঙ্গব" বলিয়া, গুরুমহাশয় দৈয়ের ভাঁড়টা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু ভাঁড়টা তুলিয়াই—গুরুমহাশয় অবাক্ হইয়া গেলেন। একি, ভাঁড় যে ভরা রহিয়াছে!

ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, গুরুমহাশয় আবার ভাঁড়টা উপুড় করিয়া সব দৈটুকু ঢালিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ভাঁড়টা আবার চীৎ করিয়া তুলিয়া ধরিতেই যেমন ছিল, তেমনই হইল!

গুরুমহাশয় অবাক্ হইয়া গেলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন আর কিছু গোলমাল না করিয়া, তিনি আস্তে আস্তে জটীলকে হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং দৈয়ের ভাঁড়টি নিয়া ঘরের ভিতর গেলেন।
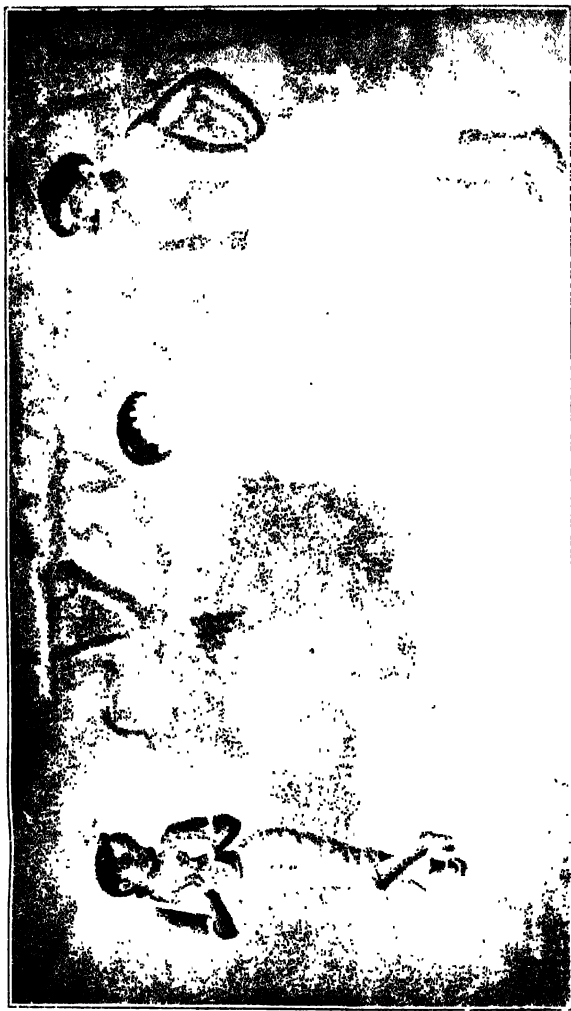
ঘরে যাইয়া তিনি বড় বড় হাঁড়ী গামলা প্রভৃতি যোগাড় করিলেন এবং সেই ভাঁড় হইতে বারংবার দৈ ঢালিয়া সব ভরিয়া ফেলিলেন। তার পর খুব পরিতোষ সহকারে লোকজনদের খাওয়ান হইল।

—৮—

সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেল। লোকজন সব চলিয়া গেলে, গুরুমহাশয় জটীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা থেকে দৈ এনেছিস্ বল ?"

জটীল তাহার মধুসূদন দাদার কথা সব বলিল। তাহা শুনিয়া গুরুমহাশয় তাহাকে দেখিতে চাহিলেন। "মধুসূদন দাদাকে দেখাব" বলিয়া জটীল গুরু-মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সেই বনের ধারে গেল।

জটীল ডাকিতেই মধুসূদন দাদা হাজির হইলেন। জটীল বলিলেন—"এই দেখুন গুরুমশায়, আমার মধুসূদন দাদা।"

গুরুমহাশয় "কৈ—কোথায় ?" বলিয়া এদিক্

ওদিক্ চাহেন—কোথাও দেখিতে পান না। কিন্তু জটীল দেখিতেছে আর বলিতেছে—"এই যে আমার সাম্‌নে, দেখ্‌তে পাচ্ছেন না ?"

গুরুমহাশয় কিন্তু কিছুতেই দেখিতে পান না।

—৯—

গুরুমহাশয় তখন বুঝিতে পারিলেন যে, এ ভগবানের ছল। তিনি মহাপাপী বলিয়া, ভগবান্ তাহাকে দেখা দিতেছেন না। তখন তিনি জটীলকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাকে মারিয়াছেন বলিয়া মাপ চাহিলেন। জটীলের কাছে মাপ চাহিতেই—গুরুমহাশয় তাহার আশে পাশে—নূপুরের রুণু-ঝুনু আওয়াজ শুনিতে পাইলেন।

জটীল তখন বলিল—"এই দেখুন গুরুমশায়, মধুসূদন দাদা কেমন নূপুর পায়ে দিয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।"

গুরুমহাশয় নূপুরের আওয়াজ পর্য্যন্তই শুনিলেন; কিন্তু কিছুতেই দেখিতে পাইলেন না—কারণ

তাঁহার মনের ময়লা দূর হয় নাই। তখন তিনি বাড়ীতে যাইয়া পূজা, জপ, দান, ধ্যান করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

জটীলের মা গরীব হইলেও খুব ভালমানুষ; তাই মধুসূদন দাদাকে দেখিতে পাইলেন।

জটীলদের আর কোন দুঃখই রহিল না। তাহারা বড়মানুষ হইল। জটীলের মা—জটীলের বিবাহ দিলেন—একটি টুকটুকে ঘর-আলো-করা বৌ ঘরে আনিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিতে লাগিলেন।

ভক্ত শিশু

—১—

তখনও সকাল হইতে দেরী আছে। সবেমাত্র পূবের আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে, দুই-চারিটা পাখী ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাজ-বাড়ীর নহবৎখানায় সবেমাত্র সানাইএর মধুর রাগিণী উঠিয়াছে। ভোরের বাতাস ফুলের গন্ধ মাখিয়া খোলা জানালার মধ্য দিয়া ঝির্‌ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে এবং ঘুমন্ত বৃষকেতুর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি আস্তে আস্তে নাড়িতেছে। এমন সময় বৃষকেতু এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিল।

আগের দিন সন্ধ্যাবেলায়, বৃষকেতু তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে 'তীর ছোড়ায়' হারিয়া আসিয়াছিল। রাস্তার ধারে মাঠে, একটা বেলগাছে অনেক বেল হইয়াছিল। সেই গাছে একটা পাখীর বাসাও ছিল। সেই পাখীর বাসার ঠিক উপরেই একটা বেল

ঝুলিতেছিল। সেই বেলটাই তীর মারিয়া পাড়িতে হইবে—এই ছিল তাহাদের খেলা।

সকলেই বলিত "বৃষকেতু খুব ভাল তীর ছুড়তে পারে," তাই তাহাকে পরখ করিবার জন্য সঙ্গীরা এই মতলব করিয়াছিল।

পাখীর বাসা আর সেই বেলটা খুব কাছাকাছি ছিল। বেলটা পাড়িতে গিয়া হঠাৎ যদি কোন রকমে তীরটা পাখীর বাসায় লাগে তাহা হইলে বাসা ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং পাখীও মরিয়া যাইবে। এই ভয়ে বৃষকেতু প্রথমে রাজী হয় নাই। কিন্তু এজন্য তাহার সঙ্গীরা যখন তাহাকে ঠাট্টা-তামাসা করিতে সুরু করিল তখন সে বাধ্য হইয়া রাজী হইল।

তীর ছোড়া আরম্ভ হইল। ছয়জনের পরে বৃষকেতুর পালা। প্রথম পাঁচজনের তীর বেলের কি পাখীর বাসার ধার দিয়াও গেল না, কিন্তু তাহার পরের ছেলেটির তীরে বাসাটা ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া গেল। পাখীগুলি চেঁচাইতে চেঁচাইতে উড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া বৃষকেতু আর তীর ছুড়িল না। পাখীর

বাসা ভাঙ্গাতে, তাহার মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল—সে ইচ্ছা করিয়াই হার মানিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল,—পরের দিন সকালে অন্য জায়গায় যাইয়া তীর ছোড়ার পরখ হইবে—ঠিক করিয়া, সকলে নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল।

বাড়ীতে আসিয়া বৃষকেতু ভালরূপ খাইতে পারিল না। পাখীর বাসার জন্য তাহার মনে খুব কষ্ট হইতেছিল, তাই সে সকাল সকাল শুইয়া পড়িল এবং সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

—২—

ভোরের বেলা বৃষকেতু স্বপ্ন দেখিল—একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিল ; তাহার কিন্তু তাহাতে কোন কষ্ট হইল না! সে ব্রাহ্মণের পেটের ভিতর গিয়া দেখিল যে, সে ভারি মজার জায়গা। সেখানে সূর্য্যের তাপ নাই, কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা আলো! নানা রকম ফুলের গাছে কত রং-বেরঙের ফুল, কত রকম সব টুকটুকে ফল ডালে

ডালে ঝুলিতেছে! কত ঝরণা, কত রকম পাখী, কত কি সব দেখিবার জিনিস! ঝির্‌-ঝির্‌ করিয়া হাওয়া বহিতেছে এবং ফুলের গন্ধ বহিয়া আনিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। বৃষকেতু সেখানে যাইতেই—যেন কত সব ফুট্‌ফুটে ছেলেমেয়ে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া খেলিবার জন্য ডাকিতে লাগিল। সে তাহাদের সঙ্গে খেলিতে যাইবে—এমন সময়ে, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে আসিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইলেন। বৃষকেতু আগে দেখে নাই, এখন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—আহা! ব্রাহ্মণের কি সুন্দর রূপ—রূপে চারিদিক্‌ যেন আলোকিত হইয়াছে! এমন রূপ সে কখনও কাহারও দেখে নাই। গা ফুটিয়া যেন হাজার হাজার ফুলের গন্ধ বাহির হইতেছে! ব্রাহ্মণ যেন হাসিতে হাসিতে বৃষকেতুকে বলিলেন, 'কেমন বৃষকেতু, এখানে থাক্‌বে? এ দেশ তোমার পছন্দ হয়?' বৃষকেতু যেন বলিল—'হাঁ, পছন্দ হয়, কিন্তু বাপ-মাকে ফেলে আমি এখানে একলা থাক্‌তে পার্‌ব না।'

তখন তিনি যেন আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন —'না, তোমার বাপ-মাকে ফেলে থাক্‌তে হবে না, তাঁদেরও এখানে নিয়ে আস্‌ব, তোমাদের জন্য এখানে বাড়ী তৈরী হচ্ছে।' এই বলিয়া তিনি যেন বৃষকেতুকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের নূতন বাড়ী দেখাইতে চলিলেন। এমন সময় বৃষকেতুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ঘুম ভাঙ্গিলে বৃষকেতু দেখিল—ঘরে কেহ নাই। সকাল হইয়া গিয়াছে। তাহার বিছানার উপর ভোরের আলো পড়িয়াছে। তখন তাহার আগের দিনের তীর ছোড়ার কথা মনে হইল। পাখীর বাসা ছিল বলিয়া সে ইচ্ছা করিয়াই হারিয়া আসিয়াছিল এবং সেই জন্যই তাহার সঙ্গীরা তাহাকে ঠাট্টা করিয়াছিল। আজ যাইয়া সে সবাইকে হারাইয়া দিবে।

হাত-মুখ ধুইয়া বৃষকেতু তীর-ধনুক লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তখন তাড়াতাড়িতে খাবার খাওয়া, কি মার কাছে স্বপ্নের কথা বলাও হইল না।

—৩—

খেলিতে গিয়া, কে জানে কেন, বৃষকেতুর মনে আপনা আপনি ভারি আমোদ হইতে লাগিল। সেদিন সে 'তীর ছোড়ায়' সকলকে হারাইয়া দিল। তখন তীর-ধনুক রাখিয়া, ধূলা নিয়া অন্য খেলা আরম্ভ হইল। কিন্তু আজ বৃষকেতুর কাছে তীর ছোড়ায় হারিয়া গিয়া তাহার সঙ্গীদের মন বড় খারাপ হইয়াছিল—তাহারা আর খেলিতে চাহিল না, নিজ নিজ বাড়ী যাইতে চাহিল। তখন বৃষকেতু তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল—"আয় ভাই, আজকের দিনটার মতন আমোদ ক'রে খেলে নিই, কাল থেকে আমি হয়ত আর তোদের সঙ্গে খেল্‌তে আস্‌তে পাব না।"

বৃষকেতুর মুখে এই কথা শুনিয়া সাথীদের সকলের মনেই কষ্ট হইল, কারণ তাহাকে সকলেই ভালবাসিত। সবাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—সে কেন খেলিতে আসিবে না? তখন বৃষকেতু তাহার সঙ্গীদের কাছে স্বপ্নের কথা বলিল। সেই

কথা শুনিয়া তাহারা সকলে অবাক্ হইয়া গেল। এমন সময়ে একজন চাকর বৃষকেতুকে খুঁজিতে আসিয়া বলিল—"মহারাজ ডাক্‌ছেন, চল।"

এ সময়ে বাড়ী হইতে কেহ কোনদিন বৃষকেতুকে ডাকিতে আসে না। আজ হঠাৎ মহারাজ ডাকিয়াছেন শুনিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন কি হয়েছে ?"

চাকরটি অনেক দিনের। সে বৃষকেতুকে কোলে পিঠে করিয়া বড় করিয়াছে এবং তাহাকে খুব ভালবাসে। বৃষকেতু যখন জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে" তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কোত্থেকে এক রাক্ষুসে বামুন এয়েছে, গোটা রাজ্যিটাই বুঝি সে খেয়ে ফেল্‌বে। তাই মহারাজ তোমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন। সর্ব্বনেশে বামুন এসেই খাই খাই কর্‌ছে।" এই বলিয়াই সে আরও হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই সব শুনিয়া আর চাকরের কান্না ও ভাবভঙ্গী

দেখিয়া বৃষকেতুর কেবলই স্বপ্নের কথা মনে পড়িতে লাগিল। সে সঙ্গীদিগকে বলিল—"ভাই, বুঝি সেই স্বপ্নের বামুন এসেছে—আমাকে খাবে।"

এই কথা শুনিয়া সঙ্গীরা সবাই চাকরটিকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে, সব কথা খুলে বল্, নইলে আমরা বৃষকেতুকে ছেড়ে দেব না।"

তখন চাকরটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"সকালে এক বুড়ো বামুন রাজসভায় এসে মহারাজের কাছে খেতে চাইলে। বামুন আগের দিন একাদশী ক'রে ক্ষিদেয় কাঁপ্‌ছিল। তা দেখে মহারাজ দয়া ক'রে সে যা খেতে চাইবে তাই দেবেন বলেছেন। তখন বামুন মহারাজকে 'তিন সত্যি' করিয়ে নিয়ে—বৃষকেতুর মাংস খেতে চাইলে। মহারাজ আর মহারাণীকে, করাত দিয়ে বৃষকেতুকে কেটে রেঁধে দিতে হবে—তবে বামুন খাবে! বামুনের কথা শুনে সভাশুদ্ধ লোক আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। বামুনকে রাক্ষস ঠাউরে মেরে তাড়িয়ে দিতে চাইলে। কিন্তু কথা দিয়েছেন—

সত্য করেছেন ব'লে মহারাজ সকলকে থামিয়ে বামুনের হাতে ধ'রে অনেক কাকুতি-মিনতি করেন এবং তাকে সমস্ত রাজ্য দিতে চাহেন,—বামুন তাতে রাজী হ'ল না। তখন মহারাজ আর রাণীমা গলায় কাপড় বেঁধে বামুনের পায়ে প'ড়ে লুটোপুটি খেতে খেতে তাঁদের নিজেদের মাংস দিতে চাইলেন বামুন তাতেও রাজী হ'ল না।—সে বৃষকেতুকেই খাবে। এই সব কথাবার্ত্তায় দেরী হ'তে দেখে বামুন রেগে চ'লে যাবার জন্য কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে দাঁড়াল। তা দেখে সত্য থাকে না ভেবে এবং আর কোন উপায় না পেয়ে, মহারাজ বৃষকেতুকে নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন।"

—৪—

চাকরের মুখে সব কথা শুনিয়া বৃষকেতুর সঙ্গীরা সকলে অবাক্ হইয়া গেল! তাহারা ভাবিল —স্বপ্নের কথা তাহা হইলে ঠিক—বুড়ো বামুন বৃষকেতুকে খাইতে আসিয়াছে। কিন্তু করাত দিয়া

কাটিয়া রান্না করিয়া খাইয়া ফেলিলে পেটের ভিতর হইতে মানুষ যে আবার কেমন করিয়া জ্যান্ত বাহির হইয়া আসে, তাহা তাহারা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। কাহারও কাছে ত এমন কথা তাহারা কখনও শুনে নাই! তাহা হইলে স্বপ্নের গোড়ার দিকটাই ঠিক—শেষটা মিথ্যা।

সঙ্গীরা সব ভাবিতে লাগিল—'তা হ'লে বৃষকেতু এখন কি কর্‌বে? উঃ—কাট্‌লে বৃষকেতুর কত লাগ্‌বে! একবার একটা বাণের ফলায় তার হাতের একটা আঙ্গুল একটুখানি কেটে গিয়েছিল, তাতেই তার কত লেগেছিল, সে কত কেঁদেছিল! তাকে কাট্‌লে সে সইবে কেমন ক'রে? তাও আবার এক কোপে ধাঁ ক'রে কাটা নয়— করাত দিয়ে আস্তে আস্তে কাটা। উঃ, মনে হ'লেও গা শিউরে ওঠে! না, সে কখনই সইতে পার্‌বে না। তবে বৃষকেতু পালাক্, বামুনটা নিশ্চয়ই রাক্ষস।'

এইরূপ ঠিক করিয়া তাহারা সকলে বৃষকেতুকে

পালাইবার পরামর্শ দিল, কেহ কেহ তাহাদের নিজেদের বাড়ীতে তাহাকে লুকাইয়া রাখিতেও চাহিল। শেষে সকলে একমত হইয়া বলিল—"বামুনটা নিশ্চয়ই রাক্ষস। বৃষকেতু যাস্‌নে, তুই পালা ভাই—পালা!"

সঙ্গীদের এইরকম কথা শুনিয়া বৃষকেতু তাহাদিগকে বলিল—"ছিঃ ভাই! অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই, বামুন—দেবতা! কেন পালিয়ে যাব? ছিঃ ছিঃ—তাও কি হয়? আমার বাপ-মা যে বামুনকে কথা দিয়েছেন ভাই, আমি আমার প্রাণের জন্য বাবা আর মাকে মিথ্যাবাদী কর্‌ব? মিথ্যা-বাদীকে লোকে নিন্দা করে, মিথ্যাবাদী নরকে যায়। আমার জন্য আমার বাপ-মা নরকে যাবেন?"

এই কথা বলিতে বলিতে বৃষকেতুর চোখে জল আসিল—সে আর বলিতে পারিল না। তাহার বাপ-মার জন্য তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে ভাবিল—প্রাণ ত তুচ্ছ, গেলই বা এমন প্রাণ। তবু সে মা-বাপের কথা নড়্‌চড়্‌

হইতে দিবে না,—এ প্রাণ সে কোথায় পাইল? সে প্রাণ দিয়াও বাপ-মায়ের কথা বজায় রাখিবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বৃষকেতু তাহার সঙ্গীদের বলিল—"না ভাই, তোরা আমাকে খারাপ পরামর্শ দিস্ নি, আমি পালাব না। আমি ছেলে হ'য়ে আমার মা-বাপের অপমান করাতে পার্‌ব না। তোরা কিছু মনে করিস্ নি, যদি বেঁচে থাকি ত আবার খেল্‌তে আস্‌ব।"

এই বলিয়া সে সঙ্গীদের কাছ হইতে বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে চাকরের সঙ্গে বাড়ীতে গেল। সে যে আজ তাহার মা-বাপের কাজে প্রাণ দিতে পারিবে—তাহার ছোট্ট একটুখানি প্রাণ দিয়া যে, সে মা-বাপের কথা বজায় রাখিতে পারিবে—এই ভাবিয়া, তাহার মনে আনন্দ আর ধরে না।

—৫—

চাকরের সঙ্গে বৃষকেতুকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বাড়ীশুদ্ধ লোক "হায় হায়"

করিয়া উঠিল। বৃষকেতু কাহারও কোন কথায় কান না দিয়া, একেবারে বরাবর রাজসভায় যাইয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়াই সভার সকল লোক চোখে কাপড় দিল। তাহার মা, রাণী পদ্মাবতী ছেলেকে বুকে টানিয়া নিতে গিয়া মূর্চ্ছা গেলেন। আর মহারাজ কর্ণ হেঁট মাথায় পুতুলের মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এই সব দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"মহারাজ! ক্ষিদের জ্বালা আর সইতে পারি নে—যা হয় শীগ্‌গির করুন। উঃ বড় ক্ষিদে—বড় ক্ষিদে! নয় ত বলুন, অন্য জায়গায় যাই।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া মহারাজ মিনতি করিয়া ব্রাহ্মণকে একটু বসিতে বলিয়া মহারাণীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইলেন। মহারাণী থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন।

তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ আবার বলিলেন—"শুনুন

মহারাজ, শুনুন মহারাণী, আপনারা এমন কাতর হ'লে, আমি আপনাদের দান নেব না। মনে ইচ্ছা না থাক্‌লে, দায়ে প'ড়ে যদি কেউ কিছু দেয়, সে দান নিলে মহাপাতক হয়। আপনারা দু'জনে মিলে করাত ধ'রে, যদি হাস্‌তে হাস্‌তে ছেলে কেটে দিতে পারেন, তবেই আমি খাব,—নইলে চল্‌লাম।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া রাজা ও রাণী তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন এবং আর একটুখানি অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

—৬—

এই সব দেখিয়া বৃষকেতু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে বাপ-মাকে বুঝাইতে লাগিল—"আমার খুব পুণ্যের জোর, তাই ব্রাহ্মণ আজ অতিথি হ'য়ে আমায় খেতে চেয়েছেন। অতিথি দেবতার তুল্য। কাজেই এমন কাজে দুঃখ করা, কি বাধা দেওয়া কিছুতেই ভাল নয়। তার ওপর

তিনি যা খেতে চাইবেন তাই খাওয়াবেন ব'লে মহারাজ কথা দিয়েছেন। এখন কি তিনি মিথ্যাবাদী হবেন? তা হ'লে আমি কখনই এছার প্রাণ রাখ্‌ব না। বামুন-অতিথি আমায় খাবেন শুনেই ত আমি নিজে বাড়ীতে এসেছি।"

কচি ছেলের মুখে এই রকম কথা শুনিয়া সভার সকল লোক অবাক্ হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ তখন আবার উঠিয়া বলিলেন —"মহারাজ, ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, আর সইতে পারি নে—এইবারে করাত আন্‌তে হুকুম করুন।"

তখন রাজার হুকুমে একজন চাকর সেইখানে একখানা করাত রাখিয়া চলিয়া গেল। সভায় যত লোক ছিল, সকলেই কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল—একজনও থাকিতে চাহিল না।

তখন মহারাজ ব্রাহ্মণকে স্নান করিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া আসিতে বলিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"না, মহারাজ! তা হবে না,

"...কাটা দেখে তবে আমি নাইতে যাব।" —৭৯ পৃঃ

ক্ষিদেয় নাড়ী জ্বল্‌ছে, কাটা দেখ্‌লেও কতকটা ঠাণ্ডা হবে। আরও কি জানেন—আমি চ'লে গেলে, যদি কাট্‌তে কাতর হন, তা হ'লে আমি ত তা টের পাব না! নিন্‌ করাত ধরুন—কাজ শেষ করুন। কাটা দেখে তবে আমি নাইতে যাব।”

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া বৃষকেতু হাসিতে হাসিতে, হামাগুড়ি দিয়া গলা বাড়াইয়া বসিল। রাজা-রাণী তখন কলের পুতুলের মত, করাতের দুইদিক দুইজনে ধরিয়া বৃষকেতুর গলায় রাখিয়া কাটিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রাহ্মণ তখন বৃষকেতুর দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া মহারাজকে বলিতে লাগিলেন—“কর কি, কর কি, —অত জোরে নয়, আস্তে আস্তে কাট—যেন বেশী রক্ত না বেরোয়—মাংস খারাপ হ'য়ে যাবে যে!”

কে জানে তখন রাজা-রাণীর জ্ঞান ছিল কিনা—তাঁহারা ঠিক কলের পুতুলের মত—ব্রাহ্মণ যেমন যেমন আদেশ দিতে লাগিলেন—ঠিক তেমনিভাবে বৃষকেতুর গলা কাটিতে লাগিলেন!

কাটা শেষ হইলে, মহারাণীকে নিজের হাতে মাংস রাঁধিতে হুকুম দিয়া, খুব আনন্দের সহিত হাসিতে হাসিতে ব্রাহ্মণ স্নান করিতে গেলেন। পথের দুইধারের লোক ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়াই —পাছে তাহাদিগকেও খাইয়া ফেলে—এই ভয়ে, "বাপরে—এলরে," বলিতে বলিতে ছুটিয়া পালাইল।

—৭—

ব্রাহ্মণ স্নান করিতে গেলে পর, মহারাজ নিজের হাতে আসন পাতিয়া ব্রাহ্মণের আহারের জায়গা করিয়া রাখিলেন।

স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়াই ব্রাহ্মণ আগেই মাংস আনিতে বলিলেন। মহারাণী পদ্মাবতী হাঁড়ীশুদ্ধ সরা ঢাকা দেওয়া সব মাংস আনিয়া ব্রাহ্মণের সাম্‌নে রাখিলেন। মহারাজ জোড়হাতে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণের আর তর্ সয় না। মহারাণী মাংস আনিয়া সেখানে রাখিতে না রাখিতেই ব্রাহ্মণ মাংস

দিতে বলিলেন। পরিবেষণ করিতে গিয়া হাঁড়ীর সরা খুলিয়াই মহারাণী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—“সর্ব্বনাশ!—হাঁড়ী যে খালি! মাংস কৈ?”

মহারাণী প্রাণপণ করিয়া রাঁধিয়াছেন—কাতর হইলে যে অতিথি খাইবেন না! তাঁহার প্রাণের ভিতর কি দুঃখ হইতেছে তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। কিন্তু হায় হায়—এত করিয়া, ছেলে কাটিয়াও বুঝি সত্য রক্ষা হইল না! উপবাসী ব্রাহ্মণ বুঝি ফিরিয়া যান!—রাজা-রাণীর মুখে কথা নাই, দুইজনে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণ তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নরমস্বরে বলিলেন—“মাংস তা হ’লে কিসে খেয়ে গেছে; তা যাক্‌, এখন এক কাজ কর। আমি নাইতে গিয়ে রাস্তায় দিব্যি একটি কচি ফুট্‌ফুটে ছেলে দেখে সঙ্গে ক’রে এনেছি, তাকে কেটে রেঁধে দাও। আমি ততক্ষণ বাইরে বসি। তোমরা এইখানে দাঁড়াও, তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ বাহির হইয়া যাইতে না যাইতেই রাজা ও রাণী মহা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন—তাঁহাদের হারান মাণিক বৃষকেতুই ছুটিয়া আসিতেছে !

বৃষকেতু আসিয়াই বাপ-মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভোরের স্বপ্নের কথা বলিল ; সে আরও বলিল—"আমরা আজ খেল্‌তে খেল্‌তে একটা গাছের তলায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নের সেই বামুনঠাকুর এসে, তোমরা আমায় খুঁজ্‌ছ ব'লে, ডেকে দিয়ে গেলেন।"

তখন রাজার হুকুমে রাজ্যশুদ্ধ 'খোঁজ-খোঁজ' সাড়া পড়িয়া গেল ; কিন্তু সে ব্রাহ্মণকে আর কেহ কোথাও দেখিতে পাইল না। সকলেই বুঝিতে পারিল যে, এই সব ভগবানের ছলনা। বাপ-মার প্রতি বৃষকেতুর কেমন ভালবাসা, কত ভক্তি, তাহাই দেখিবার জন্য ভগবান ছল করিয়া ব্রাহ্মণের বেশে এই পরীক্ষা করিয়া গেলেন।

কিন্তু বৃষকেতু নাছোড়। সে তাহার বাপ-মাকে সঙ্গে নিয়া ঠাকুরঘরে গেল এবং মাটিতে গড়াইয়া

পড়িয়া একমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। তিনি তাঁহার আসল মূর্ত্তিতে একবার সাম্‌নাসাম্‌নি দেখা না দিলে, কেহই উঠিবে না। এমনভাবে প্রাণ খুলিয়া একমনে ভগবানকে ডাকিতে পারিলে, তিনি আর কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন?

বৃষকেতু এবং রাজা-রাণী হঠাৎ দেখিলেন—ঠাকুরঘর আলোয় আলো হইয়া উঠিল। এ আলো সূর্য্যের নয়—চাঁদের নয়—মশালের নয়। বৃষকেতু স্বপ্নের দেশে যেমন আলো দেখিয়াছিল—এ সেই আলো। সেই আলোতে সবাই দেখিল—মরি মরি! আহা কি সুন্দর! শূন্যে গরুড়ের উপর বিষ্ণু বসিয়া আছেন। তাঁহার চারি হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, গলার হারে কৌস্তুভ মণি ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে—তাহার জ্যোতিতে চোখ ঠিক্‌রাইয়া যায়! তাঁহার বাঁ পায়ের হাঁটুর উপর, এক হাতে ঝাঁপি আর এক হাতে ধানের গোছা লইয়া মা লক্ষ্মী, ও ডান হাঁটুর উপর বীণা ও পুস্তক হাতে মা সরস্বতী বসিয়া আছেন! তিনজনেই

রাজা, রাণী আর বৃষকেতুর পানে চাহিয়া মিষ্টি মধুর হাসিয়া বলিলেন—"যে ছেলে বাপ-মার জন্য, বাপ-মার কাজে প্রাণ দেয়—তাকে আমরা স্বর্গে রাখি। আর, মহারাজ, মহারাণী! তোমাদের মত দাতা কেউ নেই। তোমাদের জন্য স্বর্গে বাড়ী তৈরী হচ্ছে—পৃথিবীর কাজ শেষ ক'রে তোমরা চিরকাল স্বর্গে বাস করবে।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর জ্যোতির অভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বৃষকেতু ও রাজা-রাণী পটে আঁকা ছবির মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া ভগবানের সেই ভুবন-ভুলান মূর্ত্তির দিকে অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ভক্ত শিশু বৃষকেতুর আত্মদানের ফলে তাহার মাতাপিতা ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

সমাপ্ত